প্রাকৃতিক সম্পদ ও জ্বালানি নিরাপত্তা: 'অভিশপ্ত সম্পদ' মডেলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিরোধ

আনু মুহাম্মদ

এই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে মূলত প্রান্তস্থ অর্থনীতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে বিদ্যমান মিথ ও বাস্তবতা পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে। এতে বিভিন্ন বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা তুলে দেখানো হয়েছে'সম্পদের প্রাচুর্য মানেই কোনো দেশের অবধারিত উন্নয়ন'– এই ধারণাটি সত্য নয়। ভুল নীতি, সাম্রাজ্যবাদ ও দেশি লুটেরা গোষ্ঠীর আধিপত্য এবং দুর্নীতিবান্ধব ব্যবস্থার কারণে বহুদেশ নিজেদের সম্পদ নিজেরা কাজে লাগাতে অসমর্থই শুধু নয়, সম্পদই সেখানে হয়ে উঠেছে বোঝা। 'অভিশপ্ত সম্পদ' তত্ত্বের ধারণাটিও এই সব দেশের কারণেই উদ্ভূত হয়েছে। এই লেখাটির মূল বক্তব্য হলো, জ্বালানির ওপর জনগণের সর্বময় কর্তৃত্বই জ্বালানি নিরাপত্তা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও টেকসই উন্নয়নের চাবিকাঠি। এর পক্ষে জনপ্রতিরোধই বাংলাদেশকে নতুন নিশানা দিয়েছে।

বিভিন্ন দেশের ওপর গবেষণা থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে সম্পদের প্রাচুর্য সব সময় আপনা থেকেই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে না (মেহলাম ও অন্যান্যরা, ২০০৫; সালিক ও শিফ্রিন, ২০০৫; সাকস্ ও ওয়ার্নার, ১৯৯৭; পারকিন্স, ২০০৬)। সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও অসংখ্য দেশে সম্পদ পরিণত হয়েছে অভিশাপে। 'অভিশপ্ত সম্পদ' ইস্যুটি এখন একটি বাস্তব পরিহাস।

সামরিকায়ন, যুদ্ধ, সহিংসতা ইত্যাদি যে সম্পদ লুণ্ঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা নানা তথ্যসূত্র দ্বারা প্রমাণিত, সে জন্য বহু দেশে সম্পদ উত্তোলনের সাথে সাথে দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অসাম্য এবং দমন-পীড়নও বাড়তে থাকে। (ব্লাম, ২০০৩; ফুসকাস ও গোকে, ২০০৫; (মেহলাম ও অন্যান্যরা, ২০০৫; মুহাম্মদ, ২০০৭)। ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে গৃহীত 'উন্নয়ন' ও 'অর্থনৈতিক সংস্কার'-এর জন্য প্যাকেজ প্রোগ্রাম বিশ্বের প্রান্তস্থ অর্থনীতিগুলোর জন্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে (ষ্টিগলিয, ২০০২; ভট্টাচার্য, ২০০১; মুহাম্মদ, ২০০৩)। এসব নীতি ও সংস্কার বহু দেশে আরো বেশি জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতা ও ভঙ্গুর 'উন্নয়ন' তৈরি করেছে।

প্রাকৃতিক সম্পদবহুল অনেক দেশের অর্থনীতির গতি অনেক সম্পদ-অপ্রতুল দেশের অর্থনীতির গতি থেকে দুর্বল। নাইজেরিয়া, সিয়েরা লিয়ন, অ্যাঙ্গোলার মত নিম্নপ্রবৃদ্ধিসম্পন্ন দেশগুলো প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ; অন্যদিকে 'এশিয়ার বাঘ' বলে পরিচিত কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুরের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য, অথচ এই দেশগুলো প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে দরিদ্র

বিগত দশকে তেল ও খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধিষ্ণু অনিয়ন্ত্রিত এবং ফড়িয়া বিনিয়োগের ফলে বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে মূল্যস্ফীতি; তৈরি হয়েছে কৃত্রিম সংকট ও অস্থিতিশীল বাজার (লেভিন ও কোলম্যান প্রতিবেদন, ২০০৬)। এই লেখায় জ্বালানি নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়নের ধারণাগত কাঠামো বিশ্লেষণের পর বিভিন্ন প্রান্তীয় অর্থনীতির দেশের 'অভিশপ্ত সম্পদ মডেল'কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ও বৈশ্বিক ধারণার পর্যালোচনা করে বিশেষত বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

জ্বালানিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) অভিজ্ঞতা এবং এই সব সম্পদের রপ্তানিমুখী নীতি ও প্রচারণা পরীক্ষা করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সম্পদ এবং রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে এগুলোকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশের জ্বালানিসম্পদ, নীতি ও তার পরিণতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সরকারি নীতি ও পদক্ষেপের বিপরীতে সমাজের মত ও জনগণের প্রতিরোধ অনুধাবনের জন্য তথ্য, উপাত্ত ও ঘটনাবলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। জ্বালানি বিষয়টিকে ঘিরে জনগণের স্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় নীতির বৈপরীত্য বিষয়-বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে এই লেখাতে।

জ্বালানি: সম্পদ ও নিরাপত্তা

জ্বালানি নিরাপত্তা যে কোনো দেশের টেকসই উন্নয়নের চাবিকাঠি। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (আইইএ) ভাষ্য অনুযায়ী, জ্বালানি নিরাপত্তা হলো 'পরিবেশসম্মত উপায়ে উপার্জনযোগ্য মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্যতা'। জ্বালানি নিরাপত্তা প্রশ্ন তাই প্রাথমিক সম্পদের প্রাপ্যতা ও জনগণের সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কিত, যা একই কারণে সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন প্রশ্নের সাথেও। টেকসই উন্নয়নের জন্য তাই প্রয়োজন সম্পদের এমন ব্যবহার, যার লক্ষ্য পরিবেশকে রক্ষা করে মানুষের মানবিক প্রয়োজন মেটানো। অর্থাৎ শুধুমাত্র বর্তমান প্রয়োজন নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন নিয়েও ভাবতে হবে। কেননা টেকসই উন্নয়ন হলো 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত না করে বর্তমানের প্রয়োজন মেটানো' (জাতিসংঘ, ১৯৮৭)।

ন্যূনতম কাণ্ডজ্ঞান দিয়েই এটি বোঝা যায় যে জ্বালানি নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য একটি শক্তিশালী উপাদান। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ের মতো দেশগুলো প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ এবং স্বাভাবিকভাবেই এদের জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বিশ্ব মানচিত্রের দিকে তাকালে এর বিপরীত চিত্রটিও খুব ভালোভাবেই চোখে পড়ে। খুবই বিস্ময়কর হলেও সত্য যে সম্পদের প্রাচুর্যময় অনেক দেশই 'দুর্নীতি-অনুন্নয়ন-দমনপীড়নের' ফাঁদে আটকা পড়ে আছে।

একটি গবেষণায় দেখা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদবহুল অনেক দেশের অর্থনীতির গতি অনেক সম্পদ-অপ্রতুল দেশের অর্থনীতির গতি থেকে দুর্বল। নাইজেরিয়া, সিয়েরা লিয়ন, অ্যাঙ্গোলার মত নিম্ন প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন দেশগুলো প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ; অন্যদিকে 'এশিয়ার বাঘ' বলে

পরিচিত কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুরের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য, অথচ এই দেশগুলো প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে দরিদ্র (মেহলাম ও অন্যান্যরা, ২০০৫)।

সম্পদ ও উন্নয়ন: এক বিপরীত চিত্র

সম্পদ ও উন্নয়নের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনায় রেখে সারা বিশ্বের দেশগুলোকে চারটি বর্গে ভাগ করা যায় : ক, খ, গ ও ঘ নামে এগুলোকে অভিহিত করা যায়।

ক বর্গে যে দেশগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার মধ্যে শীর্ষে আছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি। এরা শুধুমাত্র নিজের দেশের সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে তা-ই নয়, বরং বিভিন্ন উপায়ে এরা অন্য অনেক দেশের সম্পদের ওপরও কর্তৃত্ব আরোপ করছে। এই দেশগুলো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সুবিধাভোগী এবং বর্তমানেও তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। সেই সাথে বিশ্বের খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করা বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কেন্দ্রও এসব দেশেই। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অল্প কিছু বহুজাতিক কোম্পানি অসংখ্য দেশের খনিজ সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে সেসব দেশের নিজস্ব মালিকানাই হয়ে গেছে গৌণ। এসব বহুজাতিক কোম্পানির মালিকানা ঘুরেফিরে এই কয়েকটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন– কয়লার ক্ষেত্রে পৃথিবীর দুটি সর্ববৃহৎ কোম্পানি হলো বিএইচপি বিলিটন ও রিয়ো টিনটো। এদের যৌথ মালিকানার দেশ দেখানো হয়েছে যথাক্রমে 'অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্য' এবং 'যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া'।

খ বর্গে আনা যায় চীন, মালয়েশিয়া, ভারত, ব্রাজিল ও ভিয়েতনামকে। এদের রয়েছে বর্ধনশীল অর্থনীতি এবং নিজেদের সম্পদের ওপর নিজস্ব কর্তৃত্ব। খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনে তারা জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং সেসব প্রতিষ্ঠান আজকাল দেশের বাইরেও তাদের কার্যক্রম বিস্তার করেছে। এই দেশগুলোতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোই মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে ও নীতিমালা নির্ধারণ/তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে ভূতাত্ত্বিক জরিপ, খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান কর্পোরেশন, জাতীয় অনুসন্ধান কর্পোরেশন, জাতীয় প্রত্যন্ত অঞ্চল জরিপ এজেন্সি, জাতীয় ভূসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ভারতীয় খনি ব্যুরো, সেই সাথে কোল ইন্ডিয়া সে দেশের খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন ও নীতিনির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করে। বৈদেশিক বিনিয়োগ এ ক্ষেত্রে বাড়তি এবং তা কোনোভাবেই জাতীয় সংস্থার কার্যক্রমের বিকল্প নয়।

গ বর্গের দেশগুলোই 'অভিশপ্ত সম্পদের দেশ'। এই গ্রুপে রয়েছে সুদান, নাইজেরিয়া, কলম্বিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান এবং আরো অনেক দেশ। নিজের দেশের সম্পদের ওপর এদের নিজেদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। এদের অধিকাংশ দেশই শত শত বছর ধরে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অধীন উপনিবেশ ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর তারা নানা বহুজাতিক কোম্পানি, পুরনো ঔপনিবেশিক কেন্দ্র দেশ এবং স্থানীয় নিপীড়ক দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা চালিত হয়েছে। যদিও এসব দেশে বিদেশি বিনিয়োগ দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু এখানকার বিনিয়োগের ধরন এমন যে এটি কোনো কর্মসংস্থানও তৈরি করছে না, আবার অন্যদিকে জাতীয় সক্ষমতা গড়ে তোলা বা প্রযুক্তিগত উন্নয়নকেও উৎসাহিত করছে না।

সম্পদপ্রাপ্তি ও বিনিয়োগ স্পষ্টতই সম্পদ অভিশপ্ত দেশ ও পুঁজি সংবর্ধনের কেন্দ্র দেশগুলোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থে পৃথিবীর খনিজ সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্য দশকের পর দশক ধরে ব্যাপক ধ্বংস, যুদ্ধ ও রক্তপাত আমরা দেখেছি। এর সাম্প্রতিক হিংস্রতা আমরা দেখছি বিশেষত আফগানিস্তান, ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যে (ফুসকাস ও গোকে, ২০০৫)। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বব্যাপী দুর্নীতিগ্রস্ত একনায়ক ও তাদের দোসরদের মাধ্যমে সম্পদ দখল করার জন্য জ্ঞান, চিন্তা ও দক্ষতাকে ঔপনিবেশিকীকরণ করেছে।

ঘ বর্গের দেশগুলোর অধিকাংশই ল্যাটিন আমেরিকার– ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া, ইকুয়েডর ইত্যাদি। এই দেশগুলো বিগত কয়েক দশক ধরে 'অভিশপ্ত সম্পদের দেশ' হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু তারা সম্প্রতি এই ফাঁদ থেকে নিজেদের টেনে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছে। নয়া উদারনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত করেছে। সেখান থেকে তারা চেষ্টা করছে নীতি পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক চুক্তির পুনর্মূল্যায়ন এবং নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে উন্নয়নের নতুন দিশা খুঁজে পেতে। এই গ্রুপের সদস্য দেশগুলোকে দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধকতা ও সহিংসতার নারকীয় অবস্থা থেকে সংগ্রাম করে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। লুণ্ঠন, আধিপত্য ও একনায়কতন্ত্র থেকে নিজেদের জীবন ও সম্পদকে মুক্ত করতে তাদের কয়েকশ' বছরের চেষ্টা জারি রাখতে হয়েছে। সম্পদের ওপর জনগণের অধিকার চর্চার এই নতুন ধারা শুধুমাত্র একটি অর্থনৈতিক পরিবর্তন নয়, এটি নতুন ধরনের এক স্বাধীনতার নির্দেশক (গ্যালিয়ানো, ১৯৭৩; ইসিএলএসি, ২০০৬; মুহাম্মদ, ২০১২)।

> কর্পোরেট অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের মুখে প্রায়ই শোনা যায় যে খনিজ সম্পদ রপ্তানি দেশের অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি করবে। কিন্তু আমরা এর বিপরীত অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। এ বিষয়ে প্রতিকূল অভিজ্ঞতার দেশগুলোর ওপর করা একটি গবেষণা থেকে দেখা যায়, 'যেসব দেশ উচ্চহারে খনিজ সম্পদের রপ্তানি করেছে, সেসব দেশে পরবর্তী ২০ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়েছে'

এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপট এবং অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়? সে বিষয়ে যাওয়ার আগে 'অভিশপ্ত সম্পদ' (Resource Curse) মডেল নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

'অভিশপ্ত সম্পদ' মডেল

তেল ও খনিজ সম্পদের কারণে প্রতিকূল ফলভোগী দেশগুলোকেই 'অভিশপ্ত সম্পদের দেশ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (সালিক ও শিফ্রিন, ২০০৫)।

যেখানে জনবিরোধী রাজনীতি ও ক্ষমতার আধিপত্য তৈরি হয়েছে, সেখানেই অর্থনৈতিক গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য। অন্যদিকে যেসব দেশ উৎপাদনবান্ধব, জনস্বার্থমুখী নীতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, সেখানে পরিস্থিতি ভিন্ন (মেহলাম ও অন্যান্যরা, ২০০৫)।

প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ অনেক দেশের শাসকই তাদের সম্পদ লুণ্ঠন ও অপচয় করার ক্ষেত্র তৈরি করে, শুধুমাত্র হাতে গোনা কিছু মানুষের ভোগবিলাসের জন্য সম্পদ উত্তোলন করা হয়। তাই সেখানে দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও অব্যবস্থাপনা অধিকসংখ্যক মানুষকে রাখে দরিদ্র করে। ২০০৩-এ প্রকাশিত জাতিসংঘের দ্বিতীয় 'আরব মানব উন্নয়ন

রিপোর্ট' অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর অধিক নির্ভরতা অল্প কিছু মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছে, সেই সাথে অর্থনৈতিক গতিকে খর্ব করেছে ও জ্ঞানের চাহিদাকে করেছে দুর্বল (সালিক ও শিফ্রিন, ২০০৫)।

এসব দেশে দমন-পীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো প্রচুর উদাহরণ আছে, যা খনিজ সম্পদ শোষণের সাথে সম্পর্কিত। ভারতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল কার্যত সামরিক শাসনের মাধ্যমে পরিচালিত। এবং এই সমস্যাযুক্ত এলাকার অধিকাংশই প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। নাইজেরিয়ায় শেল কোম্পানি স্থানীয় নিরাপত্তাবাহিনীকে নাইজার বদ্বীপে নিপীড়ন চালানোর বাহিনীতে পরিণত করেছে; শেভরন কোম্পানি নাইজেরীয় মিলিটারি ও পুলিশকে পরিচালনা করেছে, যাতে তারা শেভরনের হেলিকপ্টার থেকে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়ে তাদের হত্যা করতে পারে (১৯৯৮ ও ১৯৯৯)। কবি ও অ্যাক্টিভিস্ট কেন সারওয়াকে তাঁর প্রতিবাদের কারণে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। ইউনোকাল কোম্পানি মিয়ানমারে সে দেশের সামরিক বাহিনীর সাথে ইয়াদানা পাইপলাইন রক্ষা করার একটি চুক্তি করেছিল। সে জন্য গ্রামবাসীকে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন করা হয়েছিল, তাদের অবকাঠামো নির্মাণে বাধ্য করা হয়েছিল (১৯৯৪-বর্তমান)। কলম্বিয়ায় দাঙ্গা পুলিশ আনা হয়েছিল ইউয়া আদিবাসী সদস্যদের উচ্ছেদ করতে, যারা অক্সিডেন্টাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানির তেল প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছিল (১৯৯০-এর শেষ ভাগ)। এটি মাদকবিরোধী অপারেশনের নামে জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত একটি অবিরাম যুদ্ধ। ইকুয়েডরের আমাজন জঙ্গলে কুইটোর কাছে কথিত 'শেল-এর শহর' দিয়ে নিরাপদ রাখা হয়েছে মিলিটারি ক্যাম্প। সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ পুরোপুরি একনায়কতন্ত্রের মধ্যে বাস করছে বহু বছর যাবৎ। কয়েক দশক ধরে বহু দেশেই এজাতীয় নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠেছে (মুহাম্মদ, ২০১১; পার্কিন্স, ২০০৬, ২০০৭)।

সৌদি আরব সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সমরাস্ত্র ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ একক ৩০ বিলিয়ন ইউএস ডলারের একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদন করেছে। এবং এটি ঘটেছে সে দেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের ক্রমবৃদ্ধির সময়ে।

রপ্তানি করো ও বিপদগ্রস্ত হও

রপ্তানি যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে দ্রব্য ও বাজারভেদে এর নানা রকম প্রভাব রয়েছে। এখানে আমরা কথা বলছি প্রকৃতি থেকে উত্তোলিত অনবায়নযোগ্য সম্পদ নিয়ে। কাণ্ডজ্ঞান দিয়েই আমরা বুঝতে পারি যে অনবায়নযোগ্য সম্পদের রপ্তানির ফলাফল আর নবায়নযোগ্য কিংবা প্রস্তুতকৃত দ্রব্যের রপ্তানির ফলাফল এক নয়। প্রান্তস্থ অর্থনীতির ক্ষেত্রে খনিজ সম্পদ রপ্তানির পক্ষে সহজেই যুক্তি দাঁড় করানো হয়। কর্পোরেট অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের মুখে প্রায়ই শোনা যায় যে খনিজ সম্পদ রপ্তানি দেশের অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি করবে। কিন্তু আমরা এর বিপরীত অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। এ বিষয়ে প্রতিকূল অভিজ্ঞতার দেশগুলোর ওপর করা একটি গবেষণা থেকে দেখা যায়, 'যেসব দেশ উচ্চহারে খনিজ সম্পদের রপ্তানি করেছে, সেসব দেশে পরবর্তী ২০ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়েছে' (সাকস্ ও ওয়ার্নার, ১৯৯৭)।

সৌদি আরবের অপরিশোধিত তেলের মজুদ এখনো বিশ্বে বৃহত্তম। সেখানে মাথাপিছু আয় ১৯৮১ সালে ২৮৬০০ ডলার থেকে সংকুচিত হয়ে ২০০১-এ এসে দাঁড়িয়েছে ৬৮০০ ডলারে; তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ২০০৮ থেকে তা আবার বৃদ্ধি পেয়েছে।

নাইজেরিয়ার গ্যাস, কয়লা, তেল ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসম্পদের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্পায়নের কাজে ব্যবহৃত হতে পারত। হিসাব অনুযায়ী নাইজেরিয়ায় ১৮৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ) নিশ্চিত প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার রয়েছে, যা বিশ্বের নবম এবং আফ্রিকার সর্ববৃহৎ গ্যাসের মজুদ (বিপি, ২০১১)। নাইজেরিয়া ওই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তেলেরও মজুদ। বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলো নাইজেরিয়ায় কয়েক দশক ধরে অনুসন্ধান ও উত্তোলন করছে, এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে তা রপ্তানির কাজও করছে। অথচ দেশটির জনগণ ব্যাপক হারে লোডশেডিং, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অনুন্নত অবকাঠামোগত সমস্যায় ভুগছে। অর্থাৎ তেল থেকে আয়কৃত অর্থ জনগণের জীবনযাত্রার মান আদৌ বাড়াচ্ছে না। বরং ১৯৭০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ থেকে বেড়ে ৭০ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে (সালিক ও শিফ্রিন, ২০০৫)।

নাইজেরিয়া ওই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তেলেরও মজুদ। বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলো নাইজেরিয়ায় কয়েক দশক ধরে অনুসন্ধান ও উত্তোলন করছে, এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে তা রপ্তানির কাজও করছে। অথচ দেশটির জনগণ ব্যাপক হারে লোডশেডিং, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অনুন্নত অবকাঠামোগত সমস্যায় ভুগছে। অর্থাৎ তেল থেকে আয়কৃত অর্থ জনগণের জীবনযাত্রার মান আদৌ বাড়াচ্ছে না। বরং ১৯৭০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ থেকে বেড়ে ৭০ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে

আরেকটি গবেষণা থেকে দেখা যায়, নাইজেরিয়ার অর্থনীতি ২০০৩ থেকে ২০১০-এ গড়ে শতকরা ৭.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও দিনে এক ডলারের নিচে আয় করা মানুষের সংখ্যা ২০০৪-এ শতকরা ৫১.৬ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে শতকরা ৬১.২-তে এসে দাঁড়িয়েছে। যেখানে ৫০ বছর আগে অপরিশোধিত তেল আবিষ্কারের পর থেকে এই জৌলুসভরা শিল্প প্রবৃদ্ধির অন্যতম উৎস ছিল, সেখানে এখন এই ক্ষেত্রের আধিপত্য 'জনগণের কাছে অভিশাপ' হয়ে চেপে বসেছে।

কয়েক বছর আগে দি ইকোনোমিস্ট পত্রিকা (৪ এপ্রিল ২০০২) মিয়ানমারের ওপর একটি রিপোর্ট করেছিল। সেখানে বলা হয়েছিল-

'জ্বালানিসম্পদসমৃদ্ধ দেশ মিয়ানমার এখন জ্বালানি তেলের চরম সংকটে ভুগছে। সে দেশের জনগণ বিদ্যুৎ সংকটে পতিত অথচ শাসকগোষ্ঠী দেশের একটি স্থিতিশীল গ্যাসের প্রবাহ পার্শ্ববর্তী দেশ থাইল্যান্ডের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। রপ্তানির এই টাকা জনগণের জীবন পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখেনি। সাম্প্রতিক হিসাবকৃত বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ২৪০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের বেশি নয়, যা শুধুমাত্র পরবর্তী ছয় সপ্তাহের আমদানি ব্যয় বহন করতে সমর্থ। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি কালোবাজারে গ্যাসোলিনের দাম ৬০০% পর্যন্ত বাড়িয়েছে এক বছরের কম সময়ের মধ্যে।'

ল্যাটিন আমেরিকার আরেকটি সম্পদসমৃদ্ধ দেশ ইকুয়েডর। এর অভিজ্ঞতাও অভিন্ন। ১৯৭০ সালের তেলের অধিক মূল্যবৃদ্ধির সময় থেকে সরকারি হিসাবে এ দেশের দারিদ্র্যের মাত্রা ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ এবং রাষ্ট্রীয় ঋণ ১৬ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে

২৪০ মিলিয়ন ডলারে। লোকসংখ্যার দরিদ্র অংশের জন্য রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ কমে ২০ থেকে ৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে (পার্কিন্স, ২০০৬)।

কঙ্গোর রয়েছে রক্তাক্ত ও নিষ্ঠুর ইতিহাস, যার জন্য মূলত দায়ী সে দেশের বিপুল পরিমাণের খনিজ সম্পদ। কঙ্গোর ৭৫ শতাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ এখন বিদেশি কোম্পানিগুলোর দখলে। খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও মাথাপিছু জিডিপি ও মানব উন্নয়ন সূচক (HDI)-এর তালিকায় কঙ্গো যথাক্রমে ১৫৮ ও ১৪২ নম্বর অবস্থানে।

বিদেশি বিনিয়োগ : অন্য কাহিনী

যে কোনো গতিশীল রাষ্ট্রের জন্য স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কী ধরনের বিনিয়োগ হচ্ছে, কী তার শর্তাবলি অর্থাৎ বিনিয়োগের গুণগত মান কী, সেটা বিবেচনায় রাখা জরুরি। গতানুগতিক উন্নয়ন অর্থশাস্ত্রে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বহুজাতিক কোম্পানিকে পুঁজির স্বল্পতার সমাধান হিসেবে দেখা হয় এবং সেই সাথে তাকে প্রান্তস্থ অর্থনীতিতে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের জন্য 'অতি নিশ্চিত সমাধান' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও মাঝেমধ্যে এসব বিশ্লেষণেও স্থানীয় বাস্তবতার আংশিক স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন–'প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ কিছু সুবিধা আনতেও পারে, কিন্তু এটি একই সঙ্গে অত্যন্ত উঁচুমাত্রায় পুঁজিঘন হতে পারে, যেখানে উদ্বৃত্ত শ্রমিক বিদ্যমান। অথবা বিনিয়োগকৃত দেশের কাছে অনেক বেশি করে তার ব্যয় দেখাতে পারে, রাতারাতি এই হিসাব পাহাড়প্রমাণ করে ফেলতে পারে, ব্যয়-সুবিধা অনুপাত ওই দেশের প্রতিকূলে নিয়ে যায়' (মিয়ের ও স্টিগলিয, ২০০১)।

> স্পষ্টতই বিশ্বব্যাংকের লক্ষ্য ব্যক্তিমালিকানা ও মুনাফামুখী তৎপরতার দিকে জ্বালানি খাতকে ঠেলে দেওয়া। তারা দাবি করে, এর মাধ্যমে–'সরকারি খাতের অপচয় দূর হবে', 'উৎপাদন ব্যয় কমবে' এবং 'প্রতিযোগিতার বাজার তৈরি হবে'। আমরা বাংলাদেশে এর বাস্তবতা পরীক্ষা করব, যা পুরোপুরি উল্টো একটি চিত্র দেবে।

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে অনেক দেশেই শুধুমাত্র জ্বালানিক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের ওপর নির্ভরতার ফলে উন্নয়ন একটি বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। জাতিসংঘের এক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ১৯৯০-এর দশকের শতকরা ৬৬ ভাগ বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। ২০০০-০৫-এ এটি ৮৭ ভাগে উন্নীত হয়। শুধুমাত্র অ্যাঙ্গোলা, চাদ, গিনি ও সুদান–এই চার তেল উৎপাদনকারী দেশ বিদেশি বিনিয়োগের শতকরা ৫৬ ভাগ গ্রহণ করেছে (আঙ্কট্যাড, ২০০৬)। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের বিদেশি বিনিয়োগ মূলত 'সম্পদ অনুসন্ধানী'। সে কারণে এ ধরনের বিনিয়োগ স্থানীয় পর্যায়ে কাজের সুযোগ, সক্ষমতা তৈরি কিংবা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন– কোনোটাই করে না। এই ক্ষেত্রগুলো যেন একেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, যেখানে দিনশেষে মুনাফা তুলে পকেটস্থ করে কেবল বহুজাতিক কোম্পানি।

খনি বিশেষজ্ঞ ও লেখক রজার মুডি তাঁর গবেষণালব্ধ বইয়ে দেখিয়েছেন, যেসব দেশ তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য বহুজাতিক কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল, তাদের অর্থনৈতিক গতি মন্থর হয়ে পড়ে। যেসব দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দারিদ্র্য ও সংঘাত নিত্য বিদ্যমান, সেসব দেশের সাথে উপরোক্ত দেশগুলোর পার্থক্য থাকে না। পৃথিবীজুড়ে নানা উদাহরণ উল্লেখ করে মুডি দেখিয়েছেন, কোম্পানিগুলো বন-জঙ্গল, পানি ও পরিবেশ ভারসাম্যের কী রকম অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে। পরিবেশ রক্ষা ও মানবাধিকার সংরক্ষণে এদের রেকর্ড অত্যন্ত ভয়াবহ (মুডি, ২০০৭)।

উন্নয়ন ও সক্ষমতা তৈরির মধ্যকার সম্পর্ক ও খনিজ সম্পদের প্রাপ্যতার ওপর একটি গবেষণা এই সিদ্ধান্ত টেনেছে যে অনেক খনিজ সম্পদসমৃদ্ধ দেশ, যেমন–জাম্বিয়া, সিয়েরা লিয়ন, কঙ্গো ও অ্যাঙ্গোলার অর্থনীতি পৃথিবীর অন্যান্য সম্পদ-অপ্রতুল দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে (জার্নাল, ২০০৬)। এই গবেষণায় আরো দেখানো হয়েছে, কোনো কোনো দেশে সম্পদ অভিশাপে পরিণত হয়েছে। সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী সুবিধামতো সম্পদ লুট করার জন্য গণতন্ত্র এবং এর প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছে।

'Fanning the Flames' শিরোনামে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে যেসব বৃহৎ খনি কোম্পানির কারণে বিভিন্ন দেশে মানবিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে আছে যুক্তরাজ্যের 'বিএইচপি' এবং অস্ট্রেলিয়ার 'রিও টিনটো'।

বাণিজ্যপ্রভুদের কর্মসূচি

এটি মাথায় রাখা সংগত যে কমন প্রপার্টি বা সাধারণ সম্পত্তির ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সংজ্ঞায়ন করা দুরূহ' এবং 'কেউ তা শোষণ করলে অপরের জন্য (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য) তা ক্ষতির কারণ হয়' (দাসগুপ্ত, ১৯৮২)।

বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ (১৯৯৯ সালে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন) অর্থশাস্ত্রে নোবেলজয়ী জোসেফ স্টিগলিয বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে বলেছিলেন, *'কোনো দেশ যদি তার প্রাকৃতিক সম্পদ বিক্রি করে, তেল কোম্পানিগুলোকে ব্যক্তিমালিকানায় দিয়ে দেয় এবং ভবিষ্যৎ আয় থেকে ঋণ করতে থাকে, তাহলে সেখানে ভোগের উচ্চ হার দেখা দিতে পারে, যা জিডিপি বৃদ্ধি করে। কিন্তু হিসাববিজ্ঞানের যথাযথ কার্যপ্রণালী দ্বারা দেখা যাবে যে দেশটি প্রকৃত অর্থে দরিদ্রতর হয়েছে।'* তিনি আরো বলেন, *'অনেক উন্নয়নশীল দেশেই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় দেওয়া আর বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা একই কথা, যেহেতু সেখানে কোনো দেশীয় প্রতিষ্ঠান নেই, যার উত্তোলনের কাজ সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় পুঁজি ও দক্ষতা আছে'* (সালিক ও শিফ্রিন, ২০০৫: ১৫-১৬)।

বাংলাদেশের গ্যাসসম্পদ নিয়ে বিতর্কের প্রশ্নেও তিনি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, *'বাংলাদেশের মতো একটি দেশের (যার গ্যাসের মজুদ সীমিত) উচিত গ্যাস বিক্রির সময় সতর্ক থাকা। কেননা ভবিষ্যতে তেলের মূল্যবৃদ্ধি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার আর কোনো কার্যকর পথ নেই'* (পূর্বোক্ত: ৫)। এ ছাড়াও একই সঙ্গে কোনো দেশকে তাদের খনিজ শিল্প/সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় দেওয়ার জন্য অযাচিত চাপ না দিতে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে পরামর্শ দিয়েছিলেন স্টিগলিয।

কিন্তু বিশ্বব্যাংক এবং এর সহযোগীদের জ্বালানিক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা রয়েছে। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানপত্রে তার আঁচ পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, *'ব্যাংক এর তেল, গ্যাস ও খনি*

নীতিমালা বিভাগ সেবা, ঋণ, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, নিশ্চয়তা ও জ্ঞান–এসবের সমন্বিত রূপ দ্বারা আইনগত, বার্ষিক ও চুক্তিভিত্তিক ইস্যু, নিয়ম ও ক্ষেত্র পুনর্নির্মাণ ও বেসরকারীকরণ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে।' স্বভাবতই এ ধরনের চেষ্টা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিমালিকানায় নিয়ে যেতে সহায়তা করে। এবং এর মাধ্যমে সরকারি খাতের অপচয় দূর করে উৎপাদন ব্যয় কমায় ও প্রতিযোগিতার সমান ময়দান তৈরি করে, যাতে বিনিয়োগকারীরা প্রতিযোগিতার বাজারে প্রবেশ করে (বিশ্বব্যাংক, ২০১১)।

অতএব, স্পষ্টতই বিশ্বব্যাংকের লক্ষ্য ব্যক্তিমালিকানা ও মুনাফামুখী তৎপরতার দিকে জ্বালানি খাতকে ঠেলে দেওয়া। তারা দাবি করে, এর মাধ্যমে– 'সরকারি খাতের অপচয় দূর হবে', 'উৎপাদন ব্যয় কমবে' এবং 'প্রতিযোগিতার বাজার তৈরি হবে'। আমরা বাংলাদেশে এর বাস্তবতা পরীক্ষা করব, যা পুরোপুরি উল্টো একটি চিত্র দেবে।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা: জ্বালানি খাতে মুনাফামুখী ব্যক্তিমালিকানা ও বিদেশি বিনিয়োগ

স্বাধীনতার পরপরই প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার-২৭ এর মাধ্যমে ২৬ মার্চ ১৯৭২-এ বাংলাদেশ তেল-গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২২ আগস্ট ১৯৭৪-এ অর্ডিন্যান্স-১৫ এর মাধ্যমে পুনর্গঠিত এই সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হয় 'পেট্রোবাংলা'। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) পেট্রোবাংলার অনুসন্ধান কাজ পরিচালনার জন্য পেট্রোবাংলার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৯-এর জুনে আত্মপ্রকাশ করে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মালয়েশিয়ার জাতীয় পেট্রোলিয়াম এজেন্সি পেট্রোনাস এবং আমাদের পেট্রোবাংলা একই সময়ে যাত্রা শুরু করে। অথচ প্রথমোক্তটি এখন বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করছে এবং 'নিউ সেভেন সিস্টার'-এর একটিতে পরিণত হয়েছে। এদিকে পেট্রোবাংলা ক্রমশ স্থানীয় ও বৈশ্বিক কর্পোরেট স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে প্রান্তিকীকৃত হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মালয়েশিয়ার জাতীয় পেট্রোলিয়াম এজেন্সি পেট্রোনাস এবং আমাদের পেট্রোবাংলা একই সময়ে যাত্রা শুরু করে। অথচ প্রথমোক্তটি এখন বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করছে এবং 'নিউ সেভেন সিস্টার'-এর একটিতে পরিণত হয়েছে। এদিকে পেট্রোবাংলা ক্রমশ স্থানীয় ও বৈশ্বিক কর্পোরেট স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে প্রান্তিকীকৃত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের জ্বালানি খাত নিয়ে বিশ্বব্যাংকের প্রথম বিস্তৃত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। ১৯৮১-এর অক্টোবরে 'এনার্জি অ্যাসেসমেন্ট মিশন'-এর অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তির ওপর ভিত্তি করে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়। একই সময় ইন্দোনেশিয়া, মৌরিতাস, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ে, হাইতি, পাপুয়া নিউ গিনি, বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা ও মালয়ের জন্যও একই ধরনের রিপোর্ট ইস্যু করা হয়।

কোনো বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা ছাড়াই এই রিপোর্টে বাংলাদেশে মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ১০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট (টিসিএফ) উল্লেখ করা হয়। বিশ্বব্যাংক এই মজুদকে 'উল্লেখযোগ্য', 'অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহারযোগ্য (রিকভারেবল) প্রাকৃতিক মজুদ গ্যাস' হিসেবে আখ্যা দেয়। তারা আবার এই বিষয়টির ওপরও জোর দেয় যে 'বর্তমান ভোগ বা ব্যবহারের মাত্রায় এই পরিমাণ গ্যাস কয়েক দশক চলবে।' এই রিপোর্টের পর দেশের 'প্রধান সম্পদের দ্রুত ও কার্যকর ব্যবহার'-এর প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেয়। কারণ এর মাধ্যমেই অর্থনীতিতে 'সাম্প্রতিক বৈদেশিক লেনদেনের সমস্যা দূর হবে এবং জ্বালানি খাত নিয়ে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড় করাতে সক্ষম হবে' (বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম, ১৯৮২: ২)।

এরপর কী কী ভাবে এই সম্পদ থেকে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে পারে, এই রিপোর্ট সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিয়েছে। এই খাতের সামগ্রিক পুনর্গঠনের পরামর্শ দিয়ে বিশ্বব্যাংক বলেছে, *'যেহেতু বাংলাদেশের সীমিত সক্ষমতা দিয়ে নিজ উদ্যোগে অনুসন্ধান কাজ চালানো সম্ভব নয়, সেহেতু এই খাতে বিদেশি তেল কোম্পানির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া উচিত'* (পূর্বোক্ত: ৪)।

সর্বোপরি এতে বলা হয়েছে, যেহেতু 'বাংলাদেশের এই গ্যাসসম্পদ বহুদিন পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হবে', সেহেতু এই রিপোর্ট 'সম্পদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের জন্য' বিভিন্ন ধরনের রপ্তানির সুযোগ প্রস্তাব করেছে। তার মানে ১৯৮২ সালেই বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবের মধ্যে ছিল–

'(ক) ভারত পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস রপ্তানি;

(খ) গ্যাস তরলায়িত করে রপ্তানি;

(গ) রপ্তানিমুখী জ্বালানিনির্ভর শিল্পকে আকর্ষণ করা; যেমন–মিথানল উৎপাদন এবং/অথবা প্রাকৃতিক গ্যাসকে ফিডস্টক হিসেবে ব্যবহার করা।'

পরবর্তীতে, ৯০-এর দশকের শেষ দিকে বিশ্বব্যাংক কথিত 'সুযোগের তালিকা' কমিয়ে একটিতে নামিয়ে আনা হয়, তাদের ভাষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের করণীয় দাঁড়ায় একটি, তা হলো 'উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থে ভারত পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস রপ্তানি করা।'

কাছাকাছি সময়ে একই ধরনের রিপোর্ট ও প্রস্তাব পাওয়া যায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকেও। একই বছরে তারা বিশ্বব্যাংকের মতো একটি বৃহৎ জ্বালানি গবেষণা ও 'বিদ্যুৎ খাতের চূড়ান্ত পরিকল্পনা'র বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করে। এই রিপোর্ট 'গ্যাসসম্পদের সবচেয়ে কার্যকর ব্যবহার'-এর প্রস্তাবে আরো বেশি সুনির্দিষ্ট ছিল। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, *'একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা হলো যে বাংলাদেশ গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিলে ভারতই হবে তার সবচেয়ে যৌক্তিক (সবচেয়ে লাভজনক) গন্তব্য। এবং বৃহৎ বাজারে বাংলাদেশ গ্যাস নিয়ে প্রবেশ করতে চাইলে কলকাতা পর্যন্ত পাইপলাইনই সবচেয়ে কার্যকর পথ। একজন ব্রিটিশ কনসালট্যান্ট, যিনি গ্যাস বিক্রির সম্ভাব্যতা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, তিনিও একে সহজসাধ্য বলেই মনে করেছেন'* (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ১৯৮২: ৬৫)।

বিদ্যুৎ খাতের জন্যও একই পথরেখা নির্দেশ করা হয়েছিল। কিভাবে সরকার, পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) ও পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি (পিবিএস) এমন একটি প্রক্রিয়ায় যুক্ত হলো, যেখানে বিশ্বব্যাংক এবং তার সংস্থা আইডিএ কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো তা উপলব্ধি করা বিদ্যুৎ খাতের পরবর্তী 'উন্নয়ন পদক্ষেপ' বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি (পিবিএস)–এই সব প্রতিষ্ঠানই পূর্ববর্তী বিভিন্ন সমীক্ষা ও পরামর্শের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল (মুহাম্মদ, ২০০৩)।

১৯৯৬-এর অক্টোবরে একই ধরনের অন্যান্য প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত 'এজেন্ডা ফর অ্যাকশন' অনুযায়ী 'বেসরকারি খাতের বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি

(পিপিজিপি)' অনুমোদন করে।

এই নীতির মূলকথা হলো, নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা তৈরি হবে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদকদের (আইপিপি) মাধ্যমে। বলাই বাহুল্য, এই প্রক্রিয়া বিদ্যুৎ খাতে ব্যক্তিমালিকানা, বিশেষত বহুজাতিক কর্পোরেশনের কর্তৃত্বে এই খাত নিয়ে আসার রাস্তা প্রশস্ত করে।

বলা হয় যে নতুন বিদ্যুৎ প্লান্ট নির্মিত হবে নির্মাণ-মালিকানা-পরিচালনার [Build-Own-Operate (BOO)] ভিত্তিতে। সরকারি খাতের চারটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলোকেও (কয়লানির্ভর বড়পুকুরিয়া, গ্যাসভিত্তিক শাহজীবাজার, বাঘাবাড়ী, সিলেট গ্যাস টার্বাইন) স্থগিত করে আইপিপির মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৯০-এর দশকের শুরু থেকে তাই নাটকীয়ভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়তে থাকে। গ্যাস, টেলিযোগাযোগ ও বিদ্যুৎ খাতে বিদেশি কোম্পানির সাথে নতুন নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে থাকে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯৬ সাল থেকে ৫ বছর গ্যাস খাতে পুঁজিপ্রবাহের সর্বোচ্চ বার্ষিক গড় পাওয়া গিয়েছিল, তার পরই ছিল বিদ্যুৎ খাত। ইপিজেডে বিদেশি বিনিয়োগ ছিল তুলনামূলক কম (বিশ্বব্যাংক, ১৯৯৯)। যদিও প্রথম দিকে টেলিযোগাযোগ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ কম ছিল, পরবর্তী বছরগুলোতে তা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে।

১৯৯৩-৯৪তে প্রথম রাউন্ডে ৬টি উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তি (পিএসসি) স্বাক্ষরিত হয়। কেয়ার্ন এনার্জি-হল্যান্ড সি সার্চকে বল্লক ১৫ ও ১৬ দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়। পরবর্তীতে হেলিবার্টন/সান্তোস ব্লক ১৬ নিয়ে নেয় এবং কেয়ার্ন/শেল পায় ব্লক ১৫। প্রাথমিকভাবে অক্সিডেন্টাল পেয়েছিল ব্লক ১২, ১৩ ও ১৪। পরে তা ইউনোকলে হাতবদল হয় এবং তারও পরে এই ব্লকগুলো চলে যায় শেভরনের কাছে। ১৭ ও ১৮ নম্বর ব্লক প্রথমে অকল্যান্ড-রেক্সউড পায়, পরে তা পায় অকল্যান্ড/তাল্লো। ইউনাইটেড মেরিডিয়ান কর্পোরেশন পায় ২২ নম্বর ব্লক। ১৯৯৭ সালে দ্বিতীয় লাইসেন্স প্রদান রাউন্ডে চারটি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়। ৫ ও ১০ নম্বর ব্লক পায় শেল-কেয়ার্ন এনার্জি, তাল্লো-শেভরন-টেক্সাকো পায় ৯ নম্বর ব্লক, ইউনোকল (পরবর্তীতে শেভরন) পায় ৭ নম্বর ব্লক। দ্বিতীয়বারের চুক্তিগুলোতে বাপেক্সকে এই সব কোম্পানির সাথে খুব ক্ষুদ্র শেয়ার দিয়ে যুক্ত করা হয়। এই চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম নিজের গ্যাস নিজেই কিনতে শুরু করে, তা-ও আবার রাষ্ট্রীয় কোম্পানিগুলো যে দামে গ্যাস সরবরাহ করত তার প্রায় ৩০ গুণ বেশি দামে, এবং কষ্টে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে।

রাষ্ট্রায়ত্ত অনুসন্ধান এজেন্সি বাপেক্স যেখানে একই কাজ করতে সক্ষম, সেখানে দক্ষতা ও পুঁজির অভাবের যুক্তি দেখিয়ে এমনভাবে নীতি নির্ধারণ করা হলো, যাতে এই কাজে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি (আইওসি) অথবা বহুজাতিক কোম্পানিকে (এমএনসি) নিয়ে আসা যুক্তিযুক্ত দেখায়। গ্যাসসমৃদ্ধ পূর্ব দিকের অংশ দিয়ে দেওয়া হয় এসব বিদেশি কোম্পানিকে। সাধারণের সম্পত্তি পরিণত হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। বেশি দামে তাদের কাছ থেকে গ্যাস কিনতে থাকায় রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় কমার বদলে (বিশ্বব্যাংক যা দাবি করে) তা আরো বেড়ে যায়। একপর্যায়ে বিশ্বব্যাংকও স্বীকার করে, 'জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক দামেই পেট্রোবাংলা আইওসির কাছ থেকে গ্যাস কেনে। এভাবে পেট্রোবাংলার ঘাটতি ক্রমশ বাড়ছে এবং পুঁজির প্রবাহ হচ্ছে ঋণাত্মক' (পূর্বোক্ত: ১৩)।

তার মানে বিদেশি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করার পর অবশেষে ১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংক নিজেই বিবৃতি দেয়, এই বিনিয়োগ 'বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অতি সামান্যই বাড়ায়'। কারণ 'বিদ্যুৎ খাতে বিদেশি বিনিয়োগের অর্থ এর নানা আমদানিতেই খরচ হয়ে যায়। ...সেভাবেই হিসাব করা হয় গ্যাসক্ষেত্রে আইওসির মূলধনি পুঁজির খরচ। টেলিকম খাতের বৈদেশিক বিনিয়োগ ও ঋণ ব্যবহৃত হয় টেলিযোগাযোগ খাতের সরঞ্জাম আমদানির উদ্দেশ্যে' (পূর্বোক্ত: ৭)।

এই কথার সূত্রে বিশ্বব্যাংক স্পষ্টভাবে জানায় যে 'বিদেশি বিনিয়োগের আমদানিবাহুল্য এবং পরবর্তীতে মুনাফার বহির্গমন ও সুদ পরিশোধের ফলাফল হলো অধিকতর লেনদেনে ঘাটতি (পূর্বোক্ত)। ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, বিদেশি বিনিয়োগে পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ এর বহিঃপ্রবাহের চেয়ে অনেক কম, যা আসে তা আবার প্রকল্প আমদানিতেই খরচ হয়ে যায়। এটি ভবিষ্যতে আরো বাড়বে– এমন প্রাক্কলনও করা হয়েছিল। কিন্তু নিজেদের সুপারিশকৃত বিদেশি বিনিয়োগের প্রতিকূল প্রভাব নিয়ে বিশ্বব্যাংকের এই স্বীকৃতি অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু এই সংকট সমাধানে তাদের পরামর্শটি ভালোভাবে খেয়াল করলে বিষয়টি খোলাসা হতে পারে। বিদেশি বিনিয়োগের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার যে সংকট তার সমাধান 'গ্যাস রপ্তানি'। কারণ 'গ্যাস রপ্তানি ব্যতীত বৈদেশিক মুদ্রার সংবর্ধন সম্ভব নয়' (পূর্বোক্ত)।

> বহুজাতিক কোম্পানির কাছ থেকে গ্যাস কেনার সময় ভর্তুকি হিসেবে যে অর্থ ব্যয় হয় তা দিয়ে প্রতিবছর কমপক্ষে একটি ৫০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ প্লান্ট তৈরি করা যেত।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকও এই নতুন সমস্যার স্বীকৃতি দিয়ে বলেছে, 'যদিও এডিবির অর্থায়নে একক কোম্পানির গ্যাস খাতের প্রকল্প লাভজনক, তা সত্ত্বেও বিদেশি কোম্পানির অধিক ব্যয়বহুল অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির কারণে পেট্রোবাংলা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।'

ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাংক ও এডিবির বাতলানো সমাধান ছিল খুবই সুনির্দিষ্ট:

(ক) আর্থিক ক্ষতি পোষানোর জন্য গ্যাসের দাম বাড়াতে হবে।
(খ) বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ কমাতে গ্যাস রপ্তানি করতে হবে।

অর্থাৎ গ্যাস রপ্তানির যে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয় ১৯৮২-তে, সেটাই ১৯৯৯ সালে একরকম বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। সরকার সেদিকেই এগোতে থাকে। ১৯৯৯ থেকে মার্কিন কোম্পানি ইউনোকলের পক্ষ থেকে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে (সিলেটের বিবিয়ানা থেকে ভারত পর্যন্ত) প্রবল প্রচারণা চলতে থাকে। এই প্রচারণার অংশ হিসেবে অনেক মার্কিন কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফর করেন, এমনকি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও ঢাকায় আসেন ২০০০ সালের মার্চ মাসে।

কিন্তু স্বাধীন বিশেষজ্ঞ ও জনসাধারণ এর বিপক্ষে অবস্থান নেন। পিএসসি ও গ্যাস রপ্তানির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে সরকার ২০০২ সালে দুটি কমিটি গঠন করে। একটি কমিটির দায়িত্ব ছিল মজুদ অবস্থা পর্যালোচনা করা, আরেকটির কাজ ছিল সর্বোত্তম ব্যবহারের পথ নির্ধারণ করা। দ্বিতীয় কমিটি সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করে গ্যাস রপ্তানির বিপক্ষে সিদ্ধান্ত টানে। তারা রিপোর্টে বলে, 'বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সম্পৃক্ততা দেশের গ্যাস অর্থনীতিকে কেবল ক্ষতিগ্রস্তই করেছে' (প্রতিবেদন, ২০০২: ৬১)।

বাড়তি বোঝার উন্নয়ন

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি থেকে এটা পরিষ্কার যে সমৃদ্ধ গ্যাস ব্লকসহ বেশির ভাগ সম্পদ বহুজাতিক কোম্পানির কাছে ইজারা দেওয়া মানে প্রকৃতপক্ষে এদের কাছে বাংলাদেশের জিম্মি হয়ে পড়া। গ্যাস ও বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে রাজস্ব ঘাটতির বোঝা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্রীয় টাকা বাঁচানোর বদলে অপচয় ও দুর্নীতি বরং বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েক বছরে বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের কাছে গ্যাস বিক্রি করে ১৬ হাজার কোটি টাকা কামিয়েছে, যা রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানির কাছ থেকে কিনলে প্রয়োজন হতো স্থানীয় মুদ্রায় মাত্র ২০০০ কোটি টাকা' (মোস্তফা ও অন্যান্যরা, ২০১০)। অর্থাৎ গ্যাস খাতে বিদেশি বিনিয়োগের একটি ক্ষেত্রের সরাসরি ফলাফল হলো ১৪ হাজার কোটি টাকার সমমানের বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়। এই পরিমাণ অর্থ তিন বছরে জ্বালানি খাতের গড় বাজেট বরাদ্দের চেয়ে বেশি।

জ্বালানি খাতে বহুজাতিক কোম্পানিকে যুক্ত করার প্রয়োজনে দুটো যুক্তিকে মিথে পরিণত করা হয়। এগুলো হলো:

(ক) বাংলাদেশের মতো দেশের প্রয়োজনীয় পুঁজি নেই। বিদেশি বিনিয়োগই পারে সেই ঘাটতি পূরণ করতে।

(খ) বাংলাদেশে উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব। বহুজাতিক কোম্পানি পারে দক্ষ ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ করতে।

কিন্তু আরো অনেক প্রান্তিক দেশের মতোই এখানে বাস্তবতা ও তথ্য ভিন্ন চিত্র দেখায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে–

(১) বেসরকারীকরণ ও জ্বালানি খাতে বহুজাতিক কোম্পানি আনার ফলে বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর দাবিমতো 'রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়' কমেনি, বরং উল্টো হয়েছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যয় আরো বেড়েছে। বহুজাতিক কোম্পানির কাছ থেকে গ্যাস কেনার সময় ভর্তুকি হিসেবে যে অর্থ ব্যয় হয় তা দিয়ে কমপক্ষে একটি ৫০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ প্লান্ট প্রতিবছর তৈরি করা যেত। এসব কোম্পানির অংশীদারিত্ব বাড়ার সাথে টাকার এই অঙ্ক ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

(২) যেখানে বাপেক্স-পেট্রোবাংলা একটি কূপ খননের জন্য ১০০ কোটি টাকা খরচ করে, সেখানে বহুজাতিক কোম্পানি এই কাজের জন্য দুই থেকে ছয় গুণ বেশি খরচ দেখায়। কাজেই 'বহুজাতিক কোম্পানি সবচেয়ে দক্ষ এবং এর উৎপাদন খরচ কম'– এটি একটি বহুল প্রচারিত মিথ।

(৩) বহুজাতিক কোম্পানিগুলো প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাসের (এমএমসিএফ) মূল্য দেয় ৩-৪ ডলার, অন্যদিকে বাপেক্সসহ জাতীয় কোম্পানিগুলো অনেক লাভ রেখেও এর শতকরা ২৫ ভাগ কম দামে গ্যাস দিতে সক্ষম।

(৪) বহুজাতিক কোম্পানির বর্ধিত অংশীদারিত্বের জন্য ভর্তুকি দিতে সরকার ধাপে ধাপে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে। উৎপাদন খরচ তথা জীবনযাপনের খরচ বৃদ্ধি এর প্রত্যক্ষ ফলাফল।

(৫) মাগুরাছড়া ও টেংরাটিলায় বিস্ফোরণের (১৯৯৭ ও ২০০৫) কারণে আমরা ৫০০ বিসিএফ গ্যাস হারিয়েছি। এই পরিমাণ গ্যাস বর্তমানে পুরো বাংলাদেশের ২০ মাসের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত গ্যাসের সমান।

(৬) মার্কিন কোম্পানি শেভরন ও কানাডীয় কোম্পানি নাইকোর কাছে আমাদের পাওনা ক্ষতিপূরণ এখনো বকেয়া রয়েছে। নষ্ট হয়ে যাওয়া গ্যাসের দাম পাঁচ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা জ্বালানি খাতে প্রতিবছরের বাজেট বরাদ্দের প্রায় আট গুণ। ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু করে কোনো সরকারই এই ক্ষতিপূরণ আদায়ে উদ্যোগী হয়নি। বরং উল্টো সরকারগুলো এদের রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক, এডিবি অথবা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা, যারা অনেক বিষয় নিয়ে ভীষণ রকম সোচ্চার, তারা এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিষয়টি নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চুপ থেকেছে।

এসব কারণে সকল তথ্যপ্রমাণ এই বিষয়টি স্পষ্ট করে যে জ্বালানি খাত ও এতে বহুজাতিক কোম্পানি যুক্ত করার যৌক্তিকতা নিয়ে বিশ্বব্যাংকের দাবি ও অবস্থান পুরোপুরি ভ্রান্ত, মিথ্যাচারপূর্ণ ও প্রতারণামূলক।

মার্কিন কোম্পানি শেভরন ও কানাডীয় কোম্পানি নাইকোর কাছে আমাদের পাওনা ক্ষতিপূরণ এখনো বকেয়া রয়েছে। নষ্ট হয়ে যাওয়া গ্যাসের দাম ৫০০০কোটি ডলারের বেশি, যা জ্বালানি খাতে প্রতিবছরের বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৮ গুণ। ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু করে কোনো সরকারই এই ক্ষতিপূরণ আদায়ে উদ্যোগী হয়নি। বরং উল্টো সরকারগুলো এদের রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক, এডিবি অথবা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা, যারা অনেক বিষয় নিয়ে ভীষণ রকম সোচ্চার, তারা এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিষয়টি নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চুপ থেকেছে।

মার্কিন তদ্বির ও কনকো-ফিলিপসের সাথে চুক্তি

সম্প্রতি উইকিলিকস মার্কিন বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশে মার্কিন প্রশাসনের তদ্বির বিষয়ে কিছু তথ্যপ্রমাণ ফাঁস করেছে। বস্তুত দালালি, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বের বহু দেশে প্রান্তস্থ সরকারকে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষায় চাপ প্রয়োগে মার্কিন প্রশাসনের সম্পৃক্ততা (বিশেষ করে জ্বালানি খাতে) এখন তথ্যপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। বিশ্বজুড়ে এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যায় যে মার্কিন সাম্রাজ্য শুধুমাত্র বৃহৎ বাণিজ্য রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনে গণহত্যা চালাতে, রক্তাক্ত রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে, ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করতে, একনায়কতন্ত্র আনতে, ভূমি দখল করতে, নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা জারি করতে কখনোই দ্বিধা করে না (ব্লাম, ২০০৩)।

এগুলো শুধু গোপনে নয়, প্রকাশ্যেও চলে। প্রকাশ্যে তারা কী ধরনের তদ্বির করে, তার উদাহরণ এখানে দিতে চাই। বাংলাদেশে ২০০১-এর সাধারণ নির্বাচনের মাসখানেক আগে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যারি অ্যান পিটারস নতুন সরকারের প্রথম ১০০ দিনের জন্য (যাকে তিনি আখ্যায়িত করেছিলেন হানিমুন পিরিয়ড বা 'মধুচন্দ্রিমার কাল' হিসেবে), পাঁচটি দফা অর্থনৈতিক কার্যধারার সুপারিশ করেন। পিটারস তাঁর অবস্থান ব্যাখ্যা করেন ১৫ মে ২০০১-এ ঢাকায় একটি বক্তৃতায়, যার শিরোনাম ছিল 'Accelerated Growth: a Challenge for the New Government' (দ্রুত প্রবৃদ্ধি : নতুন সরকারের চ্যালেঞ্জ)। এটি উপস্থাপিত হয় বাংলাদেশের আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের মাসিক মধ্যাহ্নভোজের সভায়। পিটারস তাঁর বক্তব্যে যে বিষয়গুলোতে জোর দিয়েছিলেন সেটাই তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে ছিল–

(১) ১৯৮ বছরের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর ইজারা দেওয়ার সরকার ও

স্টিভিডরিং সার্ভিস অব আমেরিকার (এসএসএ) মধ্যকার চুক্তি দ্রুত স্বাক্ষর করা ও বাস্তবায়ন করা।
(২) ভারতে গ্যাস রপ্তানির জন্য ইউনোকলের প্রকল্প দ্রুত অনুমোদন করা।

এক দশক পরে, উইকিলিকস মার্কিন দূতাবাসের গোপন তদ্বিরের কিছু তথ্য প্রকাশ করে। এ থেকে প্রকাশ পায় যে-

'মার্কিন কূটনীতিবিদরা গোপনে বাংলাদেশ সরকারকে একটি বিতর্কিত কয়লাখনির কাজ (যা জনগণের রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ দ্বারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল) পুনরায় শুরু করতে চাপ প্রয়োগ করেছিল।'

মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টির গোপন তারবার্তায় প্রকাশ পায় যে ফুলবাড়ী প্রজেক্টে জড়িত এশিয়া এনার্জি কোম্পানির (জিসিএম) ৬০ ভাগ বিনিয়োগ যুক্তরাষ্ট্রের। এশিয়া এনার্জির কর্মকর্তারা রাষ্ট্রদূতকে জানিয়েছিল যে তারা সামনের মাসেই সরকারের অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। তারবার্তা থেকে আরো প্রকাশ পায় যে-

'জ্বালানি উপদেষ্টা এই প্রকল্পের প্রতি সমর্থন তৈরি করতে সংসদীয় পদ্ধতিতে অগ্রসর হবেন।'

উইকিলিকসে মার্কিন কূটনীতিবিদের উদ্ধৃতি সংবলিত আরেকটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, মার্কিন রাষ্ট্রদূত সরকারের পেছনে লেগে ছিল, যেন মার্কিন কোম্পানি কনকো-ফিলিপসকে বঙ্গোপসাগরের দুটি ব্লক দেওয়া হয় এবং শেভরন কমপ্রেসার ব্যবসা পায়।

১৬ জুন ২০১১-তে বঙ্গোপসাগরের দুটি তেল-গ্যাসের ব্লক কনকো-ফিলিপসকে ইজারা দেওয়া হয়। এর সমস্যা, ঝুঁকি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা এবং জাতীয় কমিটি বহুভাবে নিজেদের বক্তব্য সরকার ও জনগণের সামনে উপস্থিত করে। যে বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষভাবে আপত্তি উত্থাপিত হয় সেগুলো হলো :

১) কনকো-ফিলিপসের জন্য শতকরা ৮০ ভাগ (কার্যত ১০০ ভাগ) রপ্তানির সুযোগ থাকবে। (15.5.1 Subject to Articles 15.5.4, 15.5.5 and 15.6.)
২) বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব '২০ ভাগের বেশি হবে না' (১৫.৫.৪)। তার ওপর স্থলভাগে এই ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে আসতে বাংলাদেশকেই নিজস্ব খরচে পাইপলাইন তৈরি করতে হবে, যা অর্থনৈতিকভাবে যুক্তিযুক্ত হবে না।
৩) উৎপাদনের সীমা শিথিল করে শতকরা ৭.৫ ভাগ থেকে বাড়ানো হয়েছে।
৪) যুক্ত পর্যালোচনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কনকো-ফিলিপসের আধিপত্য নিশ্চিত হয়েছে।
৫) বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে সমুদ্রবক্ষে কনকো-ফিলিপসের দুর্ঘটনার অনেক দুর্নাম রয়েছে। এই কোম্পানি সে কারণে 'দুর্ঘটনার রাজা' হিসেবে পরিচিত। তারপরও ক্ষতিপূরণের শর্তাবলি মজবুত করা হয়নি।
৬) বঙ্গোপসাগরের ওপর বাংলাদেশের কর্তৃত্ব দেশের জন্য খুবই জরুরি। কিন্তু তা এই চুক্তির ফলে হুমকির মুখে পড়বে।

এই চুক্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠেছিল এবং চুক্তি স্বাক্ষরের আগে ও পরে জনগণের সমর্থনে দুটি হরতাল পালিত হয়েছিল।

পরবর্তী বছরগুলোতে আরো ক্ষতিকর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি হওয়ার পর সমুদ্রসম্পদে বহুজাতিক কোম্পানির মনোযোগ আরো বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে, সরকারও তাদেরকে আরো 'আকর্ষণীয় প্যাকেজ' উপহার দিতে আগ্রহী।

কয়লা : আগ্রাসনের নতুন প্রান্তর

এখন পর্যন্ত জানা মতে, বাংলাদেশে পাঁচটি কয়লাখনি আছে, যাতে প্রায় তিন বিলিয়ন টন কয়লার মজুদ আছে। কয়লা খননে বাংলাদেশ তুলনামূলক নতুন এবং এখন পর্যন্ত বড় পরিসরে খননকাজ শুরু করেনি। ১৯৯০-এর প্রথম দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ খনি কোম্পানিগুলো এই অঞ্চলে ব্যবসার সম্ভাবনা সন্ধান করতে শুরু করে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ (জিএসবি) ১৯৮৫ সালে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি আবিষ্কার করে। এখানেই বাংলাদেশের প্রথম খনি উত্তোলন শুরু হয়। ২০০৪ সালে পেট্রোবাংলা চীনের একটি কোম্পানির সঙ্গে সাবকন্ট্রাক্টর নিয়োগের চুক্তি করে। পরের বছর থেকে এই খনি কার্যক্রম শুরু হয়।

> জনগণের অসম্মতি, প্রতিরোধ, ফুলবাড়ী চুক্তি, বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত—এত কিছু সত্ত্বেও এই প্রকল্পের জন্য দেশি-বিদেশি স্বার্থান্বেষী মহলের লবিং বন্ধ থাকেনি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও এই কোম্পানির পক্ষে চাপ সৃষ্টি ও লবিং অব্যাহত থেকেছে। আমরা ইতিমধ্যেই ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের ভূমিকা দেখেছি। ব্রিটিশ হাইকমিশনও এর ব্যতিক্রম নয়; ব্রিটিশ সংসদের আলোচনা থেকেই এর তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ সরকার ফুলবাড়ী কয়লাখনির অনুসন্ধান লাইসেন্স দিয়েছিল ১৯৯৪ সালে অস্ট্রেলীয় কোম্পানি বিএইচপি মিনারেলসকে। ১৯৯৭ সালে এশিয়া এনার্জি গঠিত হয় এবং বিএইচপি ১৯৯৮ সালে তার লাইসেন্স রহস্যজনকভাবে এই নতুন কোম্পানি এশিয়া এনার্জিকে হস্তান্তর করে, যা লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের বিকল্প বিনিয়োগ বাজারে তালিকাভুক্ত। ২০০৬-এ ফুলবাড়ীতে রক্তাক্ত প্রতিরোধের পর এশিয়া এনার্জি এর নাম পরিবর্তন করে রাখে 'গ্লোবাল কোল ম্যানেজমেন্ট'। এর প্রধান অংশীদার হলো পোলো রিসোর্সেস ইউএসএ, আরএবি ক্যাপিটাল, ইউবিএস, ফিডেলিটি গ্রুপ, বারক্লেস, ক্রেডিট সুইস, এলআর গ্লোবাল, অসপ্রাই ম্যানেজমেন্ট, ক্যাপিটাল গ্রুপ এবং আরগোস গ্রেটার ইউরোপ ফান্ড। শতকরা মাত্র ছয় ভাগ রয়্যালটি বাংলাদেশকে দিয়ে ৭৫-৮০ ভাগ কয়লা সুন্দরবন দিয়ে রপ্তানি করার পরিকল্পনা করা হয় (মুহাম্মদ, ২০০৭)। কোম্পানির পরিবেশের ওপর প্রভাব পর্যালোচনা (ইআইএ) এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনাও ছিল ভুল, মিথ্যা ও জালিয়াতিপূর্ণ (কালাফুট ও মুডি, ২০১০)।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আবাদি জমি, পানিসম্পদ ও জনবসতি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাতে পুরো উত্তরবঙ্গই ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সম্মুখীন হবে, আবার চুক্তি অনুযায়ী কয়লাসম্পদও দেশের কাজে লাগবে না। ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা, জননিরাপত্তা– সবই বিপর্যস্ত হবে। খুবই যৌক্তিক কারণে এই প্রকল্প ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়– প্রথমত স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারা, দ্বিতীয়ত জাতীয় ঐক্যমঞ্চ 'তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি' এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট জাতীয় কমিটি আহূত বিশাল

বাংলাদেশের কয়লাখনি

আবিষ্কারের সাল	অবস্থান	গভীরতা (মিটার)	মজুদ (মিলিয়ন টন)	মন্তব্য
১৯৬২	জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	৬৪০-১১৫৮	১০৫০	এতই গভীর যে প্রচলিত উন্মুক্ত বা ভূগর্ভস্থ পদ্ধতি দিয়ে কয়লা উত্তোলন সম্ভব নয়। অন্য কিংবা ভবিষ্যৎ কোনো প্রযুক্তি দ্বারা পদ্ধতি নির্ধারণের আলোচনা আছে।
১৯৮৫	বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর	১৩০-৫০৬	৩৯০	পেট্রোবাংলার অধীনে চীনা কোম্পানির তত্ত্বাবধানে ২০০৫ থেকে উৎপাদন হচ্ছে। ভূমিধস, জলাবদ্ধতা, পানিদূষণ দেখা দিচ্ছে।
১৯৮৯	খালাশপীর	২৫৭-৪৮২	৬৮৫	খননের জন্য প্রকল্প পেশ করেছে বেসরকারি কোম্পানি হোসাফ। এ বিষয়ে সরকারের কোনো বক্তব্য শোনা যায় না।
১৯৮৯	দিঘীপাড়া	৩২৮- ৪০৭	৫০০	পেট্রোবাংলার সমীক্ষা কাজ চলছে।
১৯৯৭	ফুলবাড়ী, দিনাজপুর	১৫০-২৪০	৫৭২	অস্ট্রেলিয়ার বিএইচপি উন্মুক্ত খনির অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর চলে যায়। আশ্চর্যজনকভাবে নতুন একটি কোম্পানি দ্বারা উন্মুক্ত খননের পরিকল্পনা করা হয়। বিশেষজ্ঞ ও জনসাধারণ তা নাকচ করে। ২০০৬-এর ২৬ আগস্ট একটি বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশে গুলি চালালে তিনজন নিহত এবং শত শত মানুষ আহত হয়। এখনো প্রতিরোধ অব্যাহত আছে।

গণজমায়েতের ওপর বিডিআর বাহিনী গুলি চালায়। এতে তিনজন শহীদ হন এবং শত শত লোক আহত হয়। এতে সারা দেশে বিক্ষোভ দানা বাঁধে এবং গণ-অভ্যুত্থানের মুখে সরকার ৩০ আগস্ট এক চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়, যা 'ফুলবাড়ী চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সরকার ও বিক্ষুব্ধ জনগণের মধ্যে। চুক্তির মূল বিষয়গুলো ছিল:

১) ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প বাতিল করতে হবে এবং এশিয়া এনার্জিকে এ দেশ থেকে বিতাড়ন করতে হবে।

২) দেশের কোথাও উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি অনুমোদন করা হবে না।

৩) খনন পদ্ধতি এবং কয়লা উন্নয়ন ও ব্যবহার সংক্রান্ত যে কোনো ব্যবস্থা নিতে আগে জনগণের মতামত নিতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।

উন্মুক্ত কয়লাখনি, বিদেশি কোম্পানি ও রপ্তানির বিরুদ্ধে এই শক্ত অবস্থানের মূল কারণ ছিল–

১) ১৫০ গ্রামের প্রায় ২,০০,০০০ মানুষকে উৎখাত করা হবে শুধুমাত্র একটি খনির কারণে।

২) খনি এলাকায় পানি নিষ্কাশনের ফলে শুধুমাত্র বৃহৎ জলাধারগুলোই (অ্যাকুইফার) ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, এতে উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশের অধিকাংশ জলাধার শুকিয়ে ওই এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হবে।

৩) খনি এলাকার বাইরের বিশাল অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাবে। এই এলাকা দেশের খাদ্যশস্য সরবরাহে বড় ভূমিকা রাখে। এ কারণে উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি দেশের খাদ্য ও পরিবেশ নিরাপত্তার হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

৪) কয়লা উত্তোলনের জন্য খাদ্য ও মানুষের নিরাপত্তা ধ্বংস করে জ্বালানি নিরাপত্তাও ধ্বংস করা হবে কয়লা রপ্তানির মাধ্যমে। চুক্তির কারণে বাংলাদেশ সেই কয়লার দামও পাবে না।

২০০৬ সালে গঠিত সরকারের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও এই প্রকল্পের বিরোধিতা করেছে এবং একে আইনত ত্রুটিপূর্ণ, পরিবেশের জন্য ধ্বংসাত্মক এবং জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে অভিহিত করে।

এশিয়া এনার্জির ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প বিষয়ে এই বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে যেসব অনিয়মের কথা তুলে ধরা হয়, তার মধ্যে আছে:

১। এশিয়া এনার্জির সঙ্গে চুক্তিতে বাংলাদেশের রয়ালটি দেখানো হয়েছে শতকরা ৬ ভাগ। কিন্তু বিএইচপির সঙ্গে চুক্তির যে সূত্র ধরে এই চুক্তি করা হয়েছে, সে সময় মিনারেল অ্যাক্টসে রয়ালটি ছিল শতকরা ২০ ভাগ।

২। এশিয়া এনার্জির কাছে বিএইচপির লাইসেন্স হস্তান্তর ঘটে ১৯৯৮ সালে, কিন্তু গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সেটা তখন বৈধ করা হয়নি।

৩। এশিয়া এনার্জি সরকারের কাছে যে 'ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান' জমা দিয়েছে, তার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে শতকরা ৩ ভাগ ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেওয়া। এই ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়া কোনো দলিলই আইনগতভাবে বৈধ নয়। বাংলাদেশ সরকারের কাছে এশিয়া এনার্জি কোনো ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেয়নি, যার পরিমাণ প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং তার দলিলপত্র পুরোটাই অবৈধ।

৪। প্রচলিত আইন অনুযায়ী যে পরিমাণ জমি উন্মুক্ত খনির জন্য দেওয়া যায়, তার ১০ গুণেরও বেশি জমি এশিয়া এনার্জিকে দেওয়া হয়েছিল খনির জন্য। সুতরাং এটিও ছিল বেআইনি।

৫। বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত নিয়ম হচ্ছে, যে কোনো উন্নয়ন

> সুন্দরবনের এই বিপন্ন অবস্থার কারণ প্রশাসন-দখলদার-লুটেরাচক্রের ক্রমবর্ধমান তৎপরতা। এযাবৎকালে এসব তৎপরতা বেআইনিভাবেই চলেছে, এখন আইনি প্রক্রিয়াতেই সুন্দরবন অঞ্চল দখল, লুণ্ঠন ও ধ্বংস করার ব্যবস্থা চলছে। শিপইয়ার্ড, জাহাজভাঙা শিল্প ছাড়াও জমি দখলের শকুনি উৎসব দেখা যাচ্ছে। সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকায় গেলেই একটু পর পর ভূমিদস্যুসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক কোম্পানির সাইনবোর্ড দেখা যায়। সুন্দরবন ধ্বংস নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করতে সবচেয়ে বড় আক্রমণ কয়লাভিত্তিক একাধিক বিদ্যুৎ প্রকল্প।

প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গেলে সেই এলাকার মানুষদের সম্মতি লাগবে। ফুলবাড়ী এলাকার মানুষের সম্মতি আছে– এই মর্মে বরাবর দেশে ও বিদেশে মিথ্যাচার করেছে এশিয়া এনার্জি।

৬। জাতিসংঘের কনভেনশনে আছে, যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের এলাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী থাকলে তাদের পূর্ণ সম্মতি নিতে হবে। অথচ ফুলবাড়ী প্রকল্প এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এই প্রকল্প দাঁড় করানো হয়েছিল (ইসলাম, ২০০৬)।

এছাড়া,

৭। এশিয়া এনার্জি 'বিনিয়োগের টাকা' দিয়ে জনগণের মধ্যে দুর্নীতি ছড়ানোর চেষ্টা করছিল। রঙিন টেলিভিশন বিতরণ ছাড়াও গ্রামে গ্রামে তারা যে ঘুষ বিতরণের চেষ্টা করেছিল, ইনফর্মার নিয়োগ করেছিল, সন্ত্রাসী তৈরি করছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।

৮। চূড়ান্ত ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার আগেই এশিয়া এনার্জি তার ওয়েবসাইটে ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প দেখিয়ে লন্ডন শেয়ারবাজারে প্রতারণা করেছে। ওয়েবসাইটে এই প্রকল্পপ্রাপ্তির খবর দিয়ে, এ ক্ষেত্রে সরকারের 'পজিটিভ' ভূমিকার কথা বলে, বড় বড় তথ্য দিয়ে, 'ওয়ার্ক অর্ডার নিশ্চিত'– এ রকম ধারণা দিয়ে কোম্পানি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার খুঁটি তৈরি করছে, লন্ডন শেয়ার মার্কেটে তার শেয়ারের দরও বেড়েছে।

পরবর্তী সময়ে সরকার গঠিত পাটওয়ারী কমিটি (২০০৮) ও মোশাররফ কমিটি (২০১২) এই প্রকল্পের বিপক্ষে মত দিলেও পরবর্তী সময়ে কোম্পানি এসব তৎপরতা অব্যাহত রাখে। জনগণের অসম্মতি, প্রতিরোধ, ফুলবাড়ী চুক্তি, বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত– এত কিছু সত্ত্বেও এই প্রকল্পের জন্য দেশি-বিদেশি স্বার্থান্বেষী মহলের লবিং বন্ধ থাকেনি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও এই কোম্পানির পক্ষে চাপ সৃষ্টি ও লবিং অব্যাহত থেকেছে। আমরা ইতিমধ্যেই ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের ভূমিকা দেখেছি। ব্রিটিশ হাইকমিশনও এর ব্যতিক্রম নয়; ব্রিটিশ সংসদের আলোচনা থেকেই এর তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। ২০০৮ সালের এপ্রিলে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে সে দেশের *'আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা' বিষয়ক মন্ত্রী গেরেথ থমাস একটি সংসদীয় প্রশ্ন-উত্তরে উল্লেখ করেন, 'আমরা ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনের মাধ্যমে জিসিএমকে (এশিয়া এনার্জি) সমর্থন জোগান দিচ্ছি। এই তদ্বিরের উদ্দেশ্য, বাংলাদেশ সরকার যেন কোম্পানির স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এবং উন্মুক্ত খনি নিষিদ্ধ না করে তা নিশ্চিত করা। ব্রিটিশ হাইকমিশন এই কোম্পানির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং তাদের যথাযথ স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকবে। বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কয়লানীতির খসড়াতে ভবিষ্যতে উন্মুক্ত খনন পদ্ধতির সুযোগ রাখা হয়েছে।'*

এটা খুবই বোধগম্য যে এত কিছু সত্ত্বেও বাংলাদেশের কয়লার জন্য মুনাফালোভী বৈশ্বিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এ দেশের জনগণের প্রতিরোধ এখনো অব্যাহত আছে।

সুন্দরবনধ্বংসী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

২০১০ সাল থেকে বৃহত্তর সুন্দরবনের রামপালে ১ হাজার ৮৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ ও বালু ভরাটের কাজ শুরু হয়। জোরপূর্বক মানুষ উচ্ছেদ করা হয়। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানির (এনটিপিসি) ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) যৌথ উদ্যোগে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানির মাধ্যমে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য পরিবেশগত সমীক্ষার (ইআইএ) কাজ শেষ হয় অনেক পরে। ২০১৩ সালের ১২ এপ্রিল এই সমীক্ষা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে এক পরামর্শ সভার আয়োজন করে পিডিবি। এর আগে এই সমীক্ষার ভয়াবহ দুর্বলতা সম্পর্কে লিখিতভাবে আপত্তি জানায় তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন। উপস্থিত সকল বিশেষজ্ঞ এই সমীক্ষার উদ্দেশ্যমূলক প্রতারণামূলক বক্তব্য, অসম্পূর্ণতা, স্ববিরোধিতা ইত্যাদি চিহ্নিত করে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সমীক্ষা যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখার দাবি জানান। কিন্তু এর এক সপ্তাহের মাথায় ২০ এপ্রিল ২০১৩-তে রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ), বাস্তবায়ন চুক্তি (আইএ), যৌথ উদ্যোগ চুক্তির সম্পূরক (এসজেভিএ) স্বাক্ষরিত হয়।

> বিভিন্ন তথ্য, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে নির্দ্বিধায় বলা যায়, বর্তমানের বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ঘাটতি মূলত সরকারের শ্রেণিগত অবস্থান, জনপন্থী উন্নয়ন দর্শনের অভাব, দুর্নীতিদুষ্ট চুক্তি ও অপরিণামদর্শী পদক্ষেপের ফলাফল। এ কারণে জাতীয় কমিটি বারবার একটি সামগ্রিক জ্বালানিনীতি ও প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখার প্রস্তাব করেছে।

সব বিশ্লেষণ, অধ্যয়ন, গবেষণা, অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রথমত, এই প্রকল্প নিয়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি অসম ও অস্বচ্ছ। দ্বিতীয়ত, এই প্রকল্পের জন্য যে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে তাতে বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বের অমূল্য সম্পদ, দেশে ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে শক্তিশালী প্রাকৃতিক রক্ষা বর্ম এবং অসাধারণ জীববৈচিত্র্যের আধার সুন্দরবনকে বাঁচানো যাবে না। আর তৃতীয়ত, এই প্রকল্প গ্রহণের প্রথম থেকেই অনিয়ম, নিপীড়ন শুরু হয়েছে। প্রয়োজনীয় সমীক্ষার শর্ত পূরণ না করেই জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সন্ত্রাসী ও পুলিশ দিয়ে জোরপূর্বক কৃষকদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।

সুন্দরবন এমনিতেই বিপন্ন। সামগ্রিক অর্থনীতিতে দখলপ্রবণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুন্দরবনেও কাঠসহ বনজ সম্পদের নির্বিচার লুণ্ঠন ও জমি দখলপ্রবণতা বেড়েছে। সুন্দরবনের এই বিপন্ন অবস্থার কারণ প্রশাসন-দখলদার-লুটেরাচক্রের ক্রমবর্ধমান তৎপরতা। এযাবৎকালে এসব তৎপরতা বেআইনিভাবেই চলেছে, এখন আইনি প্রক্রিয়াতেই সুন্দরবন অঞ্চল দখল, লুণ্ঠন ও ধ্বংস করার ব্যবস্থা চলছে। শিপইয়ার্ড, জাহাজভাঙা শিল্প ছাড়াও জমি দখলের শকুনি উৎসব দেখা যাচ্ছে। সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকায় গেলেই একটু পর পর ভূমিদস্যুসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক কোম্পানির সাইনবোর্ড দেখা যায়। সুন্দরবন ধ্বংস নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করতে সবচেয়ে বড় আক্রমণ কয়লাভিত্তিক একাধিক বিদ্যুৎ প্রকল্প।

এই প্রকল্প যে সুন্দরবন ধ্বংসের ব্যবস্থা করবে, সে বিষয়টি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দল নিবিড় গবেষণা করে নিশ্চিত করেছেন। পরিষ্কার দেখানো হয়েছে, কিভাবে এই প্রকল্প সুন্দরবন ও তার বেঁচে থাকার অবলম্বন পানি, বায়ু ও জীববৈচিত্র্যকে বিনাশ করবে। শুধু তা-ই নয়, এই দূষণ ২৫ কিলোমিটারের মধ্যে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা শহরকেও বসবাসের অনুপযোগী করে তুলবে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ

মতামত, ভারতের অভিজ্ঞতা, পরিবেশ সমীক্ষা নিয়ে প্রহসন ইত্যাদি নিয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ এখন সহজলভ্য। কিন্তু দেশি-বিদেশি মুনাফালোভী গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত হওয়ার কারণে সরকার কোনো যুক্তি তথ্য শুনতে রাজি নয়। বিশেষজ্ঞ মত ও জাতীয় জাগরণ উপেক্ষা করে ২০১৩ সালের ৫ অক্টোবর ২৫০ কিলোমিটার দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে রামপালে সেই ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেছেন।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

রাশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের প্রকল্পের সঙ্গে যে ঝুঁকি, আর্থিক বোঝা, পরিবেশসংক্রান্ত ভয়াবহতা ইত্যাদি বিষয়ে কোনো সমীক্ষা ছাড়াই রাশিয়ার ঋণে এই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উচ্চ সুদে ঋণ নেওয়া হয়েছে রাশিয়ার কাছ থেকে। এ বিষয়ে কোনো মতামত দেওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এ অঞ্চলে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা জারি করা হয়েছে।

অভিশপ্ত সম্পদ মডেলের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ

বস্তুত স্বাধীনতার পর ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশ ভালোভাবেই যাত্রা শুরু করেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এটি নয়া উদারনৈতিক (রক্ষণশীল) উন্নয়ন ধারণা, নীতি ও প্রচারণায় নিমজ্জিত হয় এবং আরেকটি অভিশপ্ত সম্পদের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদের বেসরকারীকরণ, একে বহুজাতিক কোম্পানির হাতে হস্তান্তর, গ্যাস ও কয়লা রপ্তানির প্রকল্প, উন্মুক্ত খনি, সুন্দরবনধ্বংসী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প মূলত বাংলাদেশকে সম্পদের অভিশাপের দিকে দ্রুত ঠেলে দিচ্ছে। এই মডেল বাস্তবায়নে কার্যকর আছে স্থানীয় ও বৈশ্বিক গোষ্ঠী, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি ও ক্ষমতাধর দেশগুলো (যেমন–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, চীন, রাশিয়ার সরকার এবং বিশ্বব্যাংক ও এডিবির মতো বহুজাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান)।

> অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশ এসব প্রশ্নের জালেই হাবুডুবু খাচ্ছে ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে। 'অভিশপ্ত সম্পদের' মডেলে বাংলাদেশকে পুরোপুরি টেনে নেওয়া যায়নি জনগণের প্রতিরোধের কারণেই। কিন্তু এই প্রতিরোধ এখনো বাংলাদেশকে মুক্ত করার মতো যথেষ্ট শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

যদিও এই গতি এখনো শক্তিশালী, তবু অন্যান্য সম্পদ অভিশপ্ত দেশের সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের বিশিষ্টতাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিভিন্ন জনপন্থী রাজনৈতিক দল, স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, বিশেষত ১৯৯৮ থেকে 'তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'র অব্যাহত বহুমুখী কার্যক্রমে একটি বিপরীতমুখী জাতীয় চৈতন্য ও প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। এর উদাহরণ ১৯৯৯-২০০৪ সময়কালে গ্যাস রপ্তানির বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ নির্মাণ, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ইজারা দেওয়ার চক্রান্ত বানচাল, টাটার ক্ষতিকর প্রকল্প বাতিল, ফুলবাড়ী গণ-অভ্যুত্থান এবং এর চলমানতা। ফুলবাড়ীমুখী সর্বশেষ লংমার্চ অনুষ্ঠিত হয় ২৪-৩০ অক্টোবর ২০১০। ২০১২, ২০১৩, ২০১৪-তে এশিয়া এনার্জি (জিসিএম) এলাকায় প্রবেশের নানামুখী চেষ্টা করে। প্রতিবারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ তাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। এ ছাড়া বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের বিরুদ্ধে গণ-আদালত (২০০৮), কনকো-ফিলিপসের সাথে গ্যাস চুক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২০০৯ ও ২০১১-তে দুটি সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এ ছাড়া জাতীয় স্বার্থবিরোধী গ্যাসচুক্তির বিরুদ্ধে ২০১১ তে ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-সুনেত্র লংমার্চ, সুন্দরবনধ্বংসী কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে ঢাকা-সুন্দরবন লংমার্চসহ নানা কর্মসূচি, জ্বালানি নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়নের ব্যাপারে জনগণের মনোযোগ, সর্বজনের মালিকানা ও কর্তৃত্ব বিষয়ে সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় ভূমিকার প্রশ্ন সামনে এনেছে।

বিদ্যমান আধিপত্যবিরোধী এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা জনস্বার্থবিরোধী বিভিন্ন নীতি, চুক্তি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐকমত্য তৈরি করেছে। সে কারণে নিজ দেশ, অর্থনীতি ও মানুষের স্বার্থে সম্পদ ব্যবহারের পক্ষে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি বাংলাদেশকে অভিশপ্ত মডেল থেকে রক্ষার ও ভিন্ন গতিমুখ তৈরির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এর মধ্য দিয়ে যেসব দাবি বিশেষভাবে সামনে এসেছে সেগুলো হলো:

১. সর্বজনের সম্পদে সর্বজনের পূর্ণ মালিকানা ও কর্তৃত্ব।
২. মুনাফামুখী 'নয়া উদারনৈতিক' উন্নয়ন ধারণার স্থলে সর্বজনকেন্দ্রিক উন্নয়ননীতি প্রণয়ন।
৩. বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবির ধ্বংসাত্মক নীতি প্রত্যাখ্যান। তাদেরকে জবাবদিহির আওতায় আনা। তাদের দায়মুক্তি সুবিধা বাতিল।
৪. খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান।
৫. জনগণের জীবন-জীবিকা ও পানিসম্পদ ধ্বংস করে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ।
৬. দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জনগণের সম্মতি ও অংশগ্রহণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা।
৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিষয়টি মূলধারায় নিয়ে আসা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জ্বালানিশক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তি বাংলাদেশের সর্বত্রই সারা বছর ধরে সুলভ এবং এর প্রাচুর্য গবেষকদের মনোযোগ বাড়িয়েছে (কামাল, ২০১১)। অন্য বহু দেশের তুলনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আপেক্ষিক সুবিধা অনেক বেশি। যদিও এর উৎপাদন ব্যয় এখনো বেশি, সঠিক পথে এবং সঠিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গবেষণা ও আবিষ্কার দ্রুতই নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎকে সুলভ করে তুলতে সক্ষম।

বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কিভাবে সম্ভব?

জ্বালানি খাতকে ঢালাওভাবে ব্যক্তিমালিকানায় নিয়ে যাওয়া এবং এই খাতে বহুজাতিক পুঁজি যুক্ত করতে বিভিন্ন সংস্কার সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনো নিম্ন জ্বালানি ভোগকারী দেশগুলোর একটি, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শুধুমাত্র নেপাল থেকে ওপরে অবস্থান করছে। যখন বিশ্বে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার ২৮৭৫ কিলোওয়াট/ঘণ্টা, সেখানে বাংলাদেশে তা মাত্র ২৩৬ কিলোওয়াট/ঘণ্টা। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এখনো বিদ্যুতের সুবিধা থেকে

বঞ্চিত, যারা বিদ্যুতের লাইনের সাথে যুক্ত তারাও সব সময় বিদ্যুৎ পাচ্ছে না (বিশ্বব্যাংক, ২০১১; বাংলাদেশ সরকার, ২০১৪)।

সরকারের সর্বশেষ প্রকাশনা থেকে দেখা যায়, ২০১৩-১৪ সময়কালে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১০০০০ মেগাওয়াট, তবে প্রকৃত উৎপাদন ৬০০০ থেকে ৭০০০ মেগাওয়াট। ২ ডিসেম্বর (২০১৪) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১ ডিসেম্বর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৫৯৮৭ মেগাওয়াট। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ৫২১৪ মেগাওয়াট (২৮ জানুয়ারি ২০১২)। ২০১১-তে তুলনামূলক বেশি উৎপাদন ছিল ৫১৭৪ মেগাওয়াট, ২০০৯-এ ৪২৯৬ মেগাওয়াট, ২০০৭-এ ৪১৩০ মেগাওয়াট। ২০১১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারি খাতের অংশ ছিল শতকরা ৬০, বেসরকারি খাতের অংশ (বিদেশি কোম্পানিসহ) শতকরা ৪০ ভাগ। ২০১৪ সালে এই হার হয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৪৭ ও ৫০ ভাগ, এখন ভারত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার শতকরা ৩ ভাগ। বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানির শতকরা হারেও এই কয় বছরে পরিবর্তন হয়েছে। ২০১১ সালে জ্বালানি উৎসের শতকরা অনুপাত ছিল: গ্যাস ৭৭.৩১, ডিজেল ১০.৪৫, ফার্নেস তেল ৫.০৩, কয়লা ৩.৭৬, পানি ৩.৪৫। ২০১৪ সালে এই অনুপাত দাঁড়িয়েছে : গ্যাস ৬৪.৪৩, ডিজেল ৬.৬০, ফার্নেস তেল ১৯.৪৯, কয়লা ২.৪২, পানি ২.২২ (বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; বাংলাদেশ সরকার, ২০১৪)।

জোগানের ক্ষেত্রে কর্পোরেট স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে (ক্রমবর্ধমান আইওসি অনুপাত এবং আইপিপির প্রভাব, রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল ইত্যাদি) বিদ্যুতের দাম ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে এবং এর জোগানও অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে।

জোগানের সংকট অব্যাহত থাকায় শিল্প, কৃষি– এমনকি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানও প্রায়ই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। অন্যদিকে সীমিত জোগানের জন্য যখন লোডশেডিং করা হয়, তখন সর্বজনের অগ্রাধিকার থাকে না। অপ্রয়োজনীয় অপচয়ী বিলাসী তৎপরতায় বিদ্যুতের ব্যবহার এখনো অনিয়ন্ত্রিত। তাই যখন শিল্প, হাসপাতাল ও কৃষিক্ষেত্র লোডশেডিংয়ের কবলে ভুগছে, তখন অনুৎপাদনশীল ও বিলাসের কারণে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে। শপিং মল, ভোগবিলাস, যেমন– এয়ারকন্ডিশনার ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ছে অনিয়ন্ত্রিভাবে।

জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে জাতীয় কমিটি বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান ছাড়াওজরুরি ভিত্তিতে গ্যাস ও বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানে করণীয় প্রস্তাব করেছে; যেমন– জরুরি ভিত্তিতে করণীয় :

১) জাতীয় সংস্থার আওতাধীন বৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র, যেমন– তিতাস ও হবিগঞ্জের গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানো।

২) ১২টি বন্ধ গ্যাসক্ষেত্র চালু করা।

৩) বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তাদের আওতাধীন এলাকায় অনুসন্ধান চালাতে বাধ্য করা, যে ক্ষেত্রগুলোতে তারা অসমর্থ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ সেগুলো জাতীয় সংস্থার আওতায় নিয়ে আসা।

৪) বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র মেরামত, নবায়ন ও সংস্কার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো।

বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে এই সব পদক্ষেপ নিতে খরচ হতো মাত্র ৯০০ থেকে ১২০০ কোটি টাকা, যা ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করতে পারত (রহমতুল্লাহ, ২০১১)।

মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে,

৫) সকল গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানে জাতীয় সংস্থা বাপেক্সকে সুযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল যেহেতু স্পষ্টভাবে দেখায় যে বহুজাতিক কোম্পানির সাথে পিএসসি চুক্তির ফলে অর্থনীতির শুধু ক্ষতিই বেড়েছে, সুতরাং একই কাঠামোতে আর কোনো পিএসসি স্বাক্ষর করা যাবে না (জাতীয় কমিটি, ২০১১, ২০১২; মোস্তফা ও অন্যান্যরা, ২০১০; প্রতিবেদন, ২০০২)।

তাছাড়া,

৬) স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে।

৭) স্থানীয় বিনিয়োগকারীদেরকে সৌর বিদ্যুৎ ও অধিক ব্যাটারি প্রস্তুত করতে উৎসাহিত করতে হবে।

৮) বিদ্যুৎ অপচয়ী শপিং মল, বহুতল ভবন এবং অফিস ভবন নিরুৎসাহ করতে হবে।

৯) শপিং মল, তথাকথিত ভিআইপি বাসভবন ও বিলবোর্ডের পরিবর্তে হাসপাতাল, শিল্প-কারখানা ও কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১০) হাসপাতাল ও গবেষণাগার ব্যতীত এয়ারকন্ডিশনারের ব্যবহার নিরুৎসাহ করতে হবে (একটি ছোট এসি চালাতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয় তা দিয়ে ৫০টি ফ্যান চালানো সম্ভব)।

বিভিন্ন তথ্য, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে নির্দ্বিধায় বলা যায়, বর্তমানের বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ঘাটতি মূলত সরকারের শ্রেণিগত অবস্থান, জনপন্থী উন্নয়ন দর্শনের অভাব, দুর্নীতিদুষ্ট চুক্তি ও অপরিণামদর্শী পদক্ষেপের ফলাফল। এ কারণে জাতীয় কমিটি বারবার একটি সামগ্রিক জ্বালানিনীতি ও প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখার প্রস্তাব করেছে। আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে জাতীয় সক্ষমতা বর্তমানে নয়া উদারবাদী নীতি ও বিদ্যমান দুর্নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জ্বালানি খাতকে তার পূর্ণ ক্ষমতায় বিকশিত করার জন্য উন্নয়ন দর্শনে পরিবর্তন আনা খুবই জরুরি। ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয় নীতি-কাঠামো নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই চালিকাশক্তি হিসেবে থাকতে হবে :

১) প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনগণের কর্তৃত্ব ও মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে।

২) যেহেতু এগুলো অনবায়নযোগ্য সম্পদ, সেহেতু গ্যাস, কয়লা এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ রপ্তানি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩) 'ফুলবাড়ী চুক্তি'র পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪) পরিবেশবান্ধব উপায়ে কয়লাসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের পথ অনুসন্ধানের জন্য জাতীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫) সমুদ্রসীমানা ও সমুদ্রসম্পদ রক্ষা করতে হবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একে কাজে লাগাতে হবে।

৬) মাগুরছড়া ও টেংরাটিলায় ব্লো আউট ও অনিয়মের শাস্তি/জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে এবং জ্বালানি অবকাঠামো তৈরিতে এই টাকা কাজে লাগাতে হবে।

৭) টেকসই উন্নয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতীয় জ্বালানিনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

৮) জাতীয় সক্ষমতার বিকাশ, বাপেক্স, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ

ভূতাত্ত্বিক জরিপ (জিএসবি) এবং খনিজ উন্নয়ন ব্যুরোর (বিএনডি) উপযুক্ত উন্নয়ন ঘটাতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক বিভাগ খোলা উচিত, যেন খনিজ সম্পদ যথাযথ ব্যবহারের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে দেশ থেকে ভিন্ন দেশে বিশেষজ্ঞ পাঠানো ও দেশের বাইরের বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগাতে হবে।

৯. সুন্দরবনধ্বংসী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিল করতে হবে।

১০. বিপুল সম্ভাবনাময় নবায়নযোগ্য সম্পদের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বিভিন্ন প্রণোদনার মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুকল, বায়োগ্যাস প্লান্ট ইত্যাদি তৈরি করতে উৎসাহিত করতে হবে।

উপসংহার

বিশ্ব পুঁজি আর তাদের রাজনৈতিক বাহন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সাথে জনগণের সংঘাত বিশ্বজোড়া। এই সংঘাতের পেছনে তিনটি প্রশ্ন বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় :

(ক) নিজের জীবন ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর দেশ ও জনগণের মালিকানা থাকা উচিত, নাকি তা বিশ্ব পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া উচিত?

(খ) প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের উন্নয়ন কাজে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা উচিত, নাকি বহুজাতিক কোম্পানি ও তার ক্ষুদ্র সহযোগীদের মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এগুলো তাদের স্বার্থে উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া উচিত?

(গ) এসব সম্পদ সর্বজনের সম্পদ হিসেবে গণ্য করা উচিত, নাকি বিভিন্ন কর্পোরেশনের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হতে দেওয়া উচিত?

অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশ এসব প্রশ্নের জালেই হাবুডুবু খাচ্ছে ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে। 'অভিশপ্ত সম্পদের' মডেলে বাংলাদেশকে পুরোপুরি টেনে নেওয়া যায়নি জনগণের প্রতিরোধের কারণেই। কিন্তু এই প্রতিরোধ এখনো বাংলাদেশকে মুক্ত করার মতো যথেষ্ট শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য যেমন নেই, তেমনি অভাবও নেই। নানা মাত্রায় এর সম্পদ ছড়িয়ে আছে, যেমন–উর্বর ভূমি, ভূগর্ভস্থ ও উপরস্থ পানি, সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য এবং মানবসম্পদ। গ্যাস, কয়লার মতো খনিজ সম্পদও এ দেশের আছে, যদিও তা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য অপ্রতুল। নবায়নযোগ্য অসীম সম্পদ সৌর ও বায়ুশক্তিও এখানে পর্যাপ্ত। কিন্তু এ দেশে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের পাশাপাশি দুর্নীতি ও কমিশনের মাধ্যমে পুঁজি সঞ্চয়নে ব্যস্ত শাসকগোষ্ঠীর কারণে সম্পদই হয়ে উঠছে দুশ্চিন্তার কারণ, অভিশাপ। প্রাণ প্রকৃতি পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে সমন্বিত উন্নয়ন পথ তৈরি করা যাচ্ছে না।

বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা আমাদের দেখায় যে জ্বালানি সার্বভৌমত্ব হলো জাতীয় জনসার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের চাবিকাঠি। পুঁজির কর্তৃত্ব নয়, জীবন ও সম্পদের ওপর সর্বজনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই পথ। যার ফলে আমাদের এই উপসংহার অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য 'অভিশপ্ত সম্পদের' মডেল থেকে চিরতরে বেরিয়ে এসে টিকে থাকতে এবং উন্নয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উন্নয়নের দর্শন ও রাজনীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

[এই লেখাটি ২০১৪ সালের ২৫ জানুয়ারি Economic and Political Weekly (EPW) তে প্রকাশিত "Natural Resources and Energy Security: Challenging the 'Resource-Curse' Model in Bangladesh শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদের হালনাগাদকৃত ও কিঞ্চিৎ বর্ধিত সংস্করণ। মূল লেখা অনুবাদ করেছেন আতিয়া ফেরদৌসী চৈতী।]

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: anujuniv@gmail.com

তথ্যসূত্র:

[আঙ্কটাড] UNCTAD (2006), *The Least Developed Countries Report,* Geneva, Switzerland; New York, USA: UNCTAD Secretariat.

[ইসলাম ও অন্যান্যরা] Islam, Nurul Islam et al (2006), 'Report of the Expert Committee (REC) to Evaluate Feasibility Study Report and Scheme of Development of the Phulbari Coal Project, submitted by Messieurs Asia Energy Corporation, (Bangladesh) Pvt. Ltd. (AEC) in Bangla, September. Summary of the report is available in English at: http://ncbd.org/?p=553.

[ইসিএলএসি] Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) (2006), *Social Panorama of Latin America, Santiago,* Chile: UN.

[এংডাল] Engdahl, F. William (2011), 'Perhaps 60% of Today's Oil Price is Pure Speculation', available at: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8878 (accessed 6 January 2015).

[কামাল] Kamal, Sajed (2011), *The Renewable Revolution: How We Can Fight Climate Change, Prevent Energy Wars, Revitalize the Economy and Transition to a Sustainable Future,* London, UK: Earthscan.

[কালাফুট ও মুডি] Kalafut, Jen, and Roger Moody (2010): *A Phulbari Coal Project: Studies on Displacement, Resettlement, Environmental and Social Impact.* Samhati, Dhaka.

[গ্যালিয়ানো] Galeano, Eduardo (1973), *Open Veins of Latin America,* New York, NY:Monthly Review Press.

[ঘোষ] Ghosh, Jayati (2008), 'The Global Oil Price Story', available at: http://www.networkideas.org/news/jul2008/news28_Oil_Price.htm (accessed 5 January 2015).

[জার্নাল] Economic Journal (2006), 'Institutions and the Economic Growth', *Economic Journal,* Royal Economic Society, 16 January .

[জাতিসংঘ] World Commission on Environment and Development (WCED), UN (1987), *Our Common Future,* Oxford, UK: Oxford University Press.

জাতীয় কমিটি (২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০১১, ২০১২), তেল গ্যাস খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির বিভিন্ন প্রকাশনা।

[দাসগুপ্ত] Dashgupta, Partha (1982), *The Control of Resources,* Cambridge: Harvard University Press

[পার্কিন্স] Perkins, John (2006), *Confessions of an Economic Hitman,* New York, NY, USA: Plume.

[পার্কিন্স] Perkins, John (2007), *The Secret History of the American Empire,* New York, NY, USA: Plume.

[পেট্রোবাংলা] Petrobangla (2011), *'Model Production Sharing Contract*

2008', Briefing Note on the contract with Conoco Philips, 16 June .

[প্রতিবেদন] Report (2002), Committee Report on 'Utilization of Natural Gas in Bangladesh', prepared for the Government of Bangladesh, headed by Azimuddin Ahmed, August.

[ফুসকাস ও গোকে] Fouskas, Vassilis K., Bulent Gokay (2005), *The New American Imperialism: Bush's War on Terror and Blood for Oil,* Westport, CT: Praeger Security International.

বাংলাদেশ সরকার (২০১১), *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ঢাকাঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, জুন।

বাংলাদেশ সরকার (২০১৪); *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ঢাকাঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, জুন।

[বিপি] BP (2011), *BP Statistical Review of World Energy*

[ব্লাম] Blum, William (2003), *Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II,* revised edition, State of Maine: Common Courage Press.

[বিশ্বব্যাংক] World Bank (2011), *World Development Indicators,* available at: http://data.worldbank.org/news/WDI-2011-database-and-publication-available (accessed 6 September 2011).

[বিশ্বব্যাংক] World Bank (2011a), *Extractive Industries,* available at: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,menuPK:463288~contentMDK:20219974~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336930,00.html (accessed 6 January 2015).

[বিশ্বব্যাংক] World Bank (1999), *World Bank: Foreign Direct Investment in Bangladesh: Issues of Long Run Sustainability,* October.

[ভট্টাচার্য] Bhattacharya, Debapriya and Rashed A M Titumir (2001), 'Bangladesh Experience with Structural Adjustment: Learning from a Participatory Exercise', prepared for Structural Adjustment Partcipatory Review Initiative (SAPRI), Dhaka, March.

[মোস্তফা] কল্লোল মোস্তফা, মাহবুব রুবাইয়াৎ এবং অনুপম সৈকত শান্ত (২০১০), *জাতীয় সম্পদ, বহুজাতিক পুঁজি ও মালিকানার তর্ক*, ঢাকাঃ সংহতি।

[মেহলাম ও অন্যান্যরা] Mehlum, Halvor, Karl Moene and Ragnar Torvik (2005), 'Cursed by Resources or Institutions?', *Working Paper Series 5705,* Department of Economics, Norwegian University of Science and Technology.

[মিয়ের ও স্টিগলিয] Meier, Gerald M. and Joseph E. Stiglitz (eds.) (2001), *Frontiers of Development Economics:* The Future in Perspective, Washington, USA: World Bank.

[মুডি] Moody, Roger (2007), Rocks and Hard Places: the Globalization of Mining, London, UK: Zed Books.

[মুহাম্মদ, ২০১২.] মুহাম্মদ আনু: বিপ্লবের স্বপ্নভূমি কিউবা, বিশ্বায়িত পুঁজিবাদে ল্যাটিন আমেরিকা, ঢাকাঃ শ্রাবণ।

[মুহাম্মদ] Muhammad, Anu (2011), *Development or Destruction: Essays on Global Hegemony,* Corporate Grabbing and Bangladesh, Dhaka: Sraban.

মুহাম্মদ, আনু (২০০৮), *কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশ*, ঢাকাঃ সংহতি।

মুহাম্মদ, আনু (২০০৭), *ফুলবাড়ী কানসাট গার্মেন্টস*, ঢাকাঃ শ্রাবণ।

[মুহাম্মদ] Muhammad, Anu (2006), 'Phulbari and the people's verdict', *The Daily Star,* 24 September 2006, available at: http://www.thedailystar.net/2006/09/24/d609241501130.htm (accessed 4 January 2015)

[মুহাম্মদ] Muhammad, Anu (2004), 'Foreign Direct Investment and Utilization of Natural Gas in Bangladesh', available at: http://www.networkideas.org/featart/jul2004/fa26_FDI_Gas.htm (accessed 4 January 2015).

[মুহাম্মদ] Muhammad, Anu (2003), 'Bangladesh's Integration into Global Capitalist System: Policy Direction and the Role of Global Institutions', in Matiur Rahman (ed.) *Globalisation, Environmental Crisis and Social Change in Bangladesh,* Dhaka: UPL, Dhaka.

[রহমান] Rahman, Taiabur (2008), *Parliamentary Control and Government Accountability in South Asia: A Comparative Analysis of Bangladesh, India and Sri Lanka,* London, UK: Routlege.

রহমতুল্লাহ, বিডি (২০১০), *জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সংকট- কারণ ও প্রতিকার*, ঢাকাঃ সংহতি।

[রায়] Roy, Arundhati (2011), *Walking With The Comrades,* New York, NY, USA: Penguin.

[সাকস্ ও ওয়ার্নার] Sachs, Jeffrey D. and Andrew M. Warner (1997), *Natural Resource Abundance and Economic Growth,* Cambridge, MA, USA: CID, HIID, HarvardUniversity, November.

[সালিক ও শিফ্রিন] Tsalik, Svetlana and Anya Schiffrin (eds.)(2005), *Covering Oil,* New York: Open Society Institute.

[ষ্টিগলিয] Stiglitz, Joseph E. (2002), *Globalization and its Discontent,* New York, NY, USA: Norton & Co
The Economist (April 4, 2002)

ব্যবহৃত অন্যান্য ওয়েবসাইটের লিংক

1. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/massive-us-saudi-arms-deal-seen-as-a-foreign-policy-security-and-economic-boon/2011/12/29 /gIQATNWQPP_story.html

2. http://www.france24.com/en/20120219-oil-reliance-fuels-nigerias-poverty-say-analysts?ns_campaign=editorial&ns_source=RSS_public&ns_mchannel=RSS&ns_fee=0&ns_linkname=20120219_oil_reliance_fuels_nigerias_poverty_say)

3. http://www.dominionpaper.ca/articles/119) .

4. http:// www.waronwant.org/Fanning%20the%20Flames+15142.twl .

5. www.petrobangla.org.bd.

6. http://www.bapex.com.bd

7. http://www.adb.org/Documents/Reports/SAPE/BAN /SAP-BAN-2009-36/SAP-BAN-2009-36.pdf)

8. http://www.guardian.co.uk/ world/2010/ dec/21/ wikileaks-cables-us-bangladesh-coal-mine

9. http://www.bdinn.com/news/conoco-phillips-chevron-contracts-pm%E2%80%99s-adviser-us-envoy-agreed-deals-wikileaks/

10.http://www.bpdb.gov.bd/bpdb/index.php?option=com_conent&view=article&id=126&Itemid=17